The Faculty Journal of Arts, University of Rajshahi
Volume 38, December 2024, ISSN 1813-0402

আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা

[A Comparative Study between Modern Welfare State and Islamic State]

Md. Yeamin Hossain
M.Phil Fellow, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
University of Rajshahi
Volume-38, December-2024
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI: 10.64487

Received : 31 July 2024
Received in revised: 27 February 2025
Accepted: 07 January 2025
Published: 10 August 2025

Keywords:

Modern welfare state, Social justice, Islamic economic, comparative study.

ABSTRACT

The state is a politically organized people of a definite territory. The political system is the authentic, order maintaining or transforming system in the society. A welfare state is a concept of government in which the state protects and promotes the economic and social well-being of its citizen. It also provides benefits based on the principles of equal opportunity, equitable distribution of wealth, the rule of justice and equality for a good life. The aim of this paper is to explore the definition, principles, features and comparison between a modern welfare state and an Islamic welfare state. Without the rule of law and justice, a balanced financial system, the state can't become properly welfare state and provide to its citizen fundamental rights. Lack of this essential law and order the world's richest countries have failed to reduce the poverty, unemployment and inequality from the society. Although they have been committed to provide its citizens basic needs every spare of life. So, the welfare state needs virtuous citizens. There cannot be a virtuous citizen anywhere else except in an ideal state. In the modern state, there is no permanent standard or principle for diverse between good and bad, right and wrong. Such rules can only be found in Islam. To make the law of Islam the law of the land in order that justice may prevail; to arrange social and economic relations in such a way that every individual shall live in freedom and dignity. Moreover, Islam demands a society that is righteous not only in its moral outlook, but in its deeds as well. So, this paper highlights the principle of a welfare state in a methodical waly according to Islamic Shariah.

ভূমিকা

সমাজ জীবনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সর্বজনীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হলো রাষ্ট্র। মানব সমাজ বিকাশের একটি স্তরে মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজের মধ্য থেকেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সর্বজনীন কল্যাণ সাধনকারী সংঘ, প্রতিষ্ঠান কিংবা শ্রেণিসংগঠনরূপে অভিহিত করেছেন যেখানে একটি শ্রেণি অন্য একটি শ্রেণির ওপর কর্তৃত্ব করে। কর্তৃত্বের একটি পর্যায়ে রাষ্ট্রের নাগরিকদের ওপর নেমে আসে শোষণ, জুলুম ও নিপীড়ন। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেখা দেয় নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়, সাংস্কৃতিক দুরাচার, অর্থনৈতিক নৈরাজ্য এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা। এ সব অরাজক ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শাসকশ্রেণির নির্ধারণ করে দেওয়া আইন-কানুন মানুষ বিনাবাক্য ব্যয়ে মেনে নিয়ে গৎবাঁধা জীবনযাপন করেছে তা কিছুতেই বলা যায় না। যুগে যুগে মানুষ তাঁর নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। শাসকদের জোর করে চাপানো নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে বিপ্লব ও বিদ্রোহ করেছে। ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯), ইউরোপের রেনেসাঁ আন্দোলন, কিনোসিয়ান বিপ্লব (১৯৩০) প্রভৃতি ঘটনা যার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। এসব ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের ফলে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে ষোড়শ শতাব্দীতে সমগ্র ইউরোপজুড়ে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রের নাগরিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা দিতে অর্থভিত্তিক পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকলেও তা ছিল বুর্জোয়াদের জন্য। সমাজতন্ত্রে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কথা বলা হলেও সেখানে কোনো রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না। ফলে দীর্ঘকালীন বেকারত্ব, অর্থনৈতিক মন্দা, স্থবিরতা, মুদ্রাস্ফীতি, জাতিসমূহের মধ্যে অতিপ্রাচুর্য ও অতিদারিদ্র্য পাশাপাশি অবস্থান রাষ্ট্রকে বিপদের মুখোমুখি করে। কালক্রমে অর্থনৈতিক মহামন্দা ও সমাজবাদের উত্থানের ফলে ১৯৩০ এর দিকে কিনেসিয়ান বিপ্লব ও আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। উদ্দেশ্য ছিল বেকারত্ব দূর করে সুষম ও বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিবর্জিত এ ধরনের কল্যাণ রাষ্ট্রও দারিদ্র্য নিরসন, অভাব পূরণ ও বৈষম্য কমিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে প্রয়োজন এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার যাতে আধ্যাত্মিক, দৈহিক, ব্যক্তিক,

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দিকগুলোসহ মানব জীবনের সামগ্রিক রূপরেখা থাকবে। এ ধরনের নৈতিক বিধান কেবলমাত্র সর্বশেষ জীবন বিধান ইসলাম থেকেই পাওয়া সম্ভব। ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এটি সর্বজনীন ও সর্বকালীন বিধি-বিধানের সমষ্টি। আর ইসলামী রাষ্ট্র হলো কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী শরি'আহর উপর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থা। এ রাষ্ট্রের মূলভিত্তি হলো শরি'আহ যা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত। ইসলামী রাষ্ট্রে পরামর্শের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালিত হলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শরি'আহর আলোকেই গৃহীত হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনীতির মূলভিত্তি ইনসাফ বা ন্যায়বিচার। অন্যায়াচরণের প্রতিরোধ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ইসলামের সামাজিক শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য। এ রাষ্ট্র এমন সব অর্থনৈতিক নীতি, পলিসি ও প্রতিষ্ঠান কায়েম করে যাতে কল্যাণের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় এবং দুর্নীতি দূর হয়। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো আধুনিক ও ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের স্বরূপ ও প্রকৃতি তুলে ধরার পাশাপাশি মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ধর্ম, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা।

আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা

প্রত্যেক মানুষ কোনো না কোনো রাষ্ট্রে বসবাস করে। সময়ের পরিবর্তনে এক সময় মানুষের সমাবদ্ধ জীবন যাপনের ধারণা থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি। রাষ্ট্র বা State শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'স্ট্যাটাস' থেকে এসেছে। যার অর্থ রাজ্য, রাষ্ট্র, অবস্থা, প্রদেশ, সরকার। যা কখনো আইনানুগভাবে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে এমন ব্যক্তিদের অস্তিত্ব থাকা, কখনো রাজার কখনো বা প্রজাতন্ত্রের অবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রীক ও রোমানদের লেখায় রাষ্ট্র শব্দের পরিবর্তে 'পোলিশ' (Polis) এবং 'সিভিটাস' (Civitas) শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। গ্রীকদের নগরের আশে পাশে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে যে রাষ্ট্র গঠিত হয় তাঁকে নগর রাষ্ট্র বা City State বলে আখ্যায়িত করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও 'রাজ্য', 'দেশ', 'সমাজ' 'সরকার' ও 'জাতির' মতো শব্দকে প্রায়ই রাষ্ট্রের সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করেছেন।[১] যেমনটি আমরা দেখি ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যর বেলায়। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রকে একটি রাষ্ট্র (State) বলা হয়। আবার এদের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যকে আলাদাভাবে রাষ্ট্র (State) বলা হয়। অনুরূপভাবে সমগ্র সোভিয়েত রাশিয়া প্রজাতন্ত্র। আবার রাশিয়ার অঙ্গরাজ্যগুলো (Republic) প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত। তাই State বা Republic যেমন একটি রাষ্ট্র হতে পারে তেমনি অঙ্গরাজ্য বা প্রজাতন্ত্র মিলেও একটি রাষ্ট্র হতে পারে। আবার রাষ্ট্র (State) বলতে যুক্তরাষ্ট্রের (Federation) অঙ্গরাজ্যগুলোকে বোঝায়।[২] রাষ্ট্র হলো একটি ভূখণ্ডভিত্তিক রাজনৈতিক সমাজ বিশেষ, যার সংগঠিত সরকার ও জনসমষ্টি রয়েছে। যে সরকার নিজস্ব ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের ওপর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক তত্ত্ববিদরা রাষ্ট্রকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনের জন্য কিছু পরিবার ও গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত সংস্থাকে রাষ্ট্র বলে । অ্যারিস্টটলের মতে,''আমাদের পর্যবেক্ষণে এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই হচ্ছে কোন উত্তম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষের সমবায়ে গঠিত একটি সংস্থা।''[৩] রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আর. এম ম্যাকাইভার (MacIver) বলেন,''The state is an association which acting through law as promulgated by government endowed to this end with coercive power, maintaining within a community territorially demarcated, the universal external condition of social order ''[৪] অর্থাৎ রাষ্ট্র হচ্ছে সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা পরিচালিত একটি সংগঠন যার কর্তৃত্বমূলক ক্ষমতা রয়েছে এবং যা নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বসবাসরত নাগরিকদের ওপর তা প্রয়োগ করে। অধ্যাপক ড. জে. এন গার্নারের (J.N Garner) মতে,'রাষ্ট্র হলো বহুসংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত এমন সমাজ, যারা নির্দিষ্ট ভূখন্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, যা বহির্শক্তির নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত এবং যাদের একটি সুসংগঠিত সরকার আছে, যে সরকারের প্রতি ঐ জনসমাজ স্বভাবতই অনুগত।''[৫] উড্রোউইলসন (Wooderow Wilson) এর সংজ্ঞা অধিকতর যুক্তিযুক্ত তাঁর মতে,'' A state is a people organized for law within a definite territory' অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘটিত জনসমষ্টিকেই রাষ্ট্র'বলে [৬]। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড লাস্কি (Harold Laski) রাষ্ট্র বলতে একটি ভৌগোলিক সমাজব্যবস্থার কথা বলেন যা নিজস্ব ভূখণ্ডের শাসক-শাসিতের মাঝে বিভক্ত ও ভূখন্ডের সকল নাগরিকের উপর স্বীয় কর্তৃত্ব দাবি করে। তাঁর মতে,''The modern state is a territorial society divided into government and subjects, claiming within its allotted physical area supremacy over all other institutions.''[৭] অধ্যাপক বার্জেস (Burges) রাষ্ট্রকে মানবজাতির একটি অংশ এবং সংগঠিত একটি একক বলে অভিহিত করেছেন।[৮] রাষ্ট্রের (state) পরিবর্তে 'রাজনৈতিক ব্যবস্থা' (Political system) শব্দটিও ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ডেভিড ইস্টন (Devid Eston) রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে লক্ষস্থির ও নিজেকে রূপান্তর করার সৃষ্টিশীল এক ব্যবস্থার কথা বলেছেন। তাঁর মতে,''A goal setting, self-transforming and creatively adaptive system.''[৯] গ্যাব্রিয়েল আব্রাহাম অ্যালমন্ড রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে একটি শৃঙ্খলারক্ষাকারী ও রূপান্তর সাধনকারী ব্যবস্থার কথা বলেছেন।

আধুনিক রাষ্ট্রের উপাদান

প্রত্যেক মানুষ কোনো না কোনো রাষ্ট্রে বসবাস করে। সময়ের পরিবর্তনে একসময় মানুষের সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের ধারণা থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়।[১০] কার্ল মার্কস (১৮১৮-৮৩ খ্রি.) ও ম্যাক্স ওয়েবার (১৮৬৪-১৯২০ খ্রি.) এর মতো রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা

জনসংখ্যা, ভূখন্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্বকে রাষ্ট্রের উপাদান বলেছেন।[১১] জনসমষ্টি বলতে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত নাগরিককে বোঝায়। যা রাষ্ট্র গঠনের জন্য অপরিহার্য। রাষ্ট্র গঠনের জন্য জনংখ্যা কত হবে তার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তবে প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের জনসংখ্যা নির্ধারণ করেছিলেন ৫০৪০। ফরাসি দার্শনিক রুশো অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁর সামাজিক চুক্তির বইতে আদর্শ রাষ্ট্রের জন্য দশহাজার জনসংখ্যার কথা উল্লেখ করেন।[১২] তবে নির্দিষ্ট জনসংখ্যার সীমা বেঁধে দেওয়া আধুনিক রাষ্ট্রের বেলায় মৌলিক ব্যাপার নয়। মৌলিক বিষয় রাষ্ট্রের আইন ও আইনের প্রতি জনগণের আনুগত্য। প্রতিষ্ঠিত একটি আধুনিক রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কয়েক কোটি থেকে কয়েক হাজার হতে পারে। যেমন ভারত, চিন ও রাশিয়ার জনসংখ্যা একশ কোটির উপরে। রাষ্ট্রের দ্বিতীয় উপাদান হলো নির্দিষ্ট ভূখন্ড। ভূখণ্ড বলতে স্থলভাগ, সমুদ্রসীমা, আকাশসীমাও বোঝায়। প্রতিটি রাষ্ট্রই ভূখন্ডের সীমানাকেন্দ্রিক নিরাপত্তা বেষ্টনি গড়ে তোলে। ভূখণ্ড বড় বা ছোট হতে পারে। নির্দিষ্ট ভূখন্ডের আয়তন কত হতে হবে এ বিষয়ের কোন সীমারেখা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ঠিক করে দেয়নি। যদিও এরিস্টটল রাষ্ট্রের আয়তন কত হবে তা ঠিক করে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে গাছপালা বৃদ্ধির যেমন একটি পরিমাণ আছে, তেমনি রাষ্ট্রের জনসমষ্টির জীবনধারণ এবং মানবিক বিকাশের জন্য একটি সীমারেখা থাকা উচিত। দার্শনিক রুশোর দৃষ্টিতে রাষ্ট্র আকারে যত ক্ষুদ্র হবে সে অনুপাতে তার শক্তিও তেমন বড়ো হবে। তাছাড়া আয়তনে বড় হলে শাসন কার্য চালানো কষ্টকর হয়। বৃহদাকার রাষ্ট্র রাজতন্ত্রের জন্য উপযোগী এবং মধ্যম পর্যায়ের রাষ্ট্র গণতন্ত্রের জন্য উপযোগী। ডি-টকভিল বিশাল সাম্রাজ্যকে জন সাধারণের কল্যাণ ও স্বাধীনতার বিরোধী বলেছেন। তবে একথাও সত্য যে তাঁরা মূলত নগর রাষ্ট্রের আদর্শ সামনে রেখে ভূখণ্ডের পরিসীমা নির্ধারণে আগ্রহী ছিলেন। রাশিয়ার মতো প্রদেশ পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ জুরে রয়েছে। কিন্তু সেখানে শাসন কার্যের ব্যাঘাত হচ্ছে এমন কথা শোনা যায় না। আবার ক্ষুদ্রতর দেশ লুক্সেমবার্গ ও জর্ডানের শাসনকার্যে যে অত্যন্ত দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে তাও বলা যায় না।[১৩] রাষ্ট্রের তৃতীয় উপাদানটি হলো সরকার। কোন ভূখন্ডের কতগুলো লোক একত্রিত হয়ে বসবাস করলেই তা রাষ্ট্র হয় না। রাষ্ট্র হওয়ার জন্য এমন একটি প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন যা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। এ ধরনের জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে সরকার বলে। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ইচ্ছার প্রতিফিলন ঘটে ও কার্যকর হয়ে থাকে। যে প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে, আইন প্রণয়ন করে ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গ্রহণ করে তাদেরকে সরকার বলে।[১৪] রাষ্ট্রগঠনের অপর আর একটি মুখ্য উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌম শব্দ দ্বারা এমন চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়, যে ক্ষমতা রাষ্ট্র পরিচালনা ও নীতি নির্ধারণ করে। [১৫] সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রের গঠনের পূর্ণতা পায়। এ ক্ষমতা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংস্থা থেকে আলাদা করে। সার্বভৌম ক্ষমতার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুইটি দিক রয়েছে। অভ্যন্তরীণ এই ক্ষমতার ফলে রাষ্ট্র সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। অন্যদিকে বাহ্যিক ক্ষমতা বলে বহির্শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা ও উৎপত্তি

যে রাষ্ট্রের সরকার শুধু প্রতিরক্ষা, প্রশাসন আইন, বিচার ও মুদ্রা সম্পর্কিত রুটিন দায়িত্বই পালন করে না বরং জনগণের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই রাষ্ট্রকেই কল্যাণ রাষ্ট্র বলে।[১৬] যে রাষ্ট্রের জনগণ একত্রিত হয়ে পরস্পরকে সৎ কাজ সম্পাদন ও সদগুণাবলি ও শান্তি অর্জনে সহায়তা করে তাকে কল্যাণ রাষ্ট্র বলে। এ ধরনের রাষ্ট্রে সামাজিক নিরাপত্তা, সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা, যোগ্যতা অনুযায়ী কাজকর্ম করার বা পাবার অধিকার রয়েছে। যেখানে বৈষম্যের কোন স্থান নেই।[১৭] যে রাষ্ট্র নাগরিকের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করে। জনগণকে আর্থিকভাবে সাহায্য করে, বেকার ভাতার ব্যবস্থা করে ও বেকারত্ব নির্মুলের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। দারিদ্র্য ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্টির জন্য সার্বজনীন পেনশনের ব্যবস্থা করে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করে। এ সম্পর্কে Oxford dictionary of politics বলা হয়েছে 'A system in which the government undertakes the main responsibility for providing for the social and economic security of the state's population by means of pensions, social security benefits, free healthcare, and so forth.' [১৮] অর্থাৎ যে রাষ্ট্রে সরকার তাঁর নাগরিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্পদের সুষম বন্টন ও সামজিক নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, বাধ্যতামূলক বেকারত্ব বীমা কর্মসূচী ও কাজ করতে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। এ সম্পর্কে উইল ক্যান্টন (Will Kenton) বলেন, 'The term welfare state refers to a type of governing in which the national government plays a key role in the protection and promotion of the economic and social well-being of its citizens.' [১৯]

বর্তমানে প্রতিটি আধুনিক রাষ্ট্র কল্যাণ রাষ্ট্র দাবি করলেও বিশেষ পরিস্থিতিতে এ ধরণের রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। ১৮৪০ সালে জার্মানির প্রথম চ্যান্সেলর অটোভন বিসমার্ক প্রুশিয়া এবং স্যাকসনিতে ব্যবসায়ীদের সমর্থন আদায়ের জন্য আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করেন।[২০] বিসমার্ক বৃদ্ধাশ্রম, পেনশন, দুর্ঘটনা বীমা,ও চিকিৎসা সেবা চালু করেন। পরবর্তীতে

১৯০৬-১৯১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হারবার্ট ১৯০৮ সালে ওল্ড এজ পেনশন আইন পাস করেন । ১৯০৯ সালে বিনামুল্যে স্কুলে দুপরের খাবার, শ্রম বিনিময় আইন, উন্নয়ন আইন, জাতীয় বীমা আইন গড়ে তোলেন। কল্যাণ রাষ্ট্রের ধরণ কার্যাবলী সম্পর্কে নানা মত রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেনে এ ধরনের রাষ্ট্রের নানা বাস্তব দৃষ্টান্ত রয়েছে। ১৯৩০ সালের অর্থনৈতিক মহামন্দা ও সমাজবাদের উত্থান পুঁজিবাদের ভিত ধসিয়ে দেয়। যার ফলে কিনোসিয়ান বিপ্লব ও কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যামপিটার ও টয়েনবির মতো মার্কসবাদী এমন অনেক অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পুঁজিবাদের পতনের ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন। দীর্ঘস্থায়ী মহামন্দা অর্থনীতিবিদ 'সে'[২১] এর অর্থনীতির সুত্রের উপর আস্থা নষ্ট করে দেয়। এ থেকে প্রমানিত হয় যে অর্থনীতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধিত হয়ে আদর্শ স্থানে ফিরে আসার ক্ষমতা নেই। অর্থনৈতিক সংকটকালীন সময়ে বৃটিশ ও অন্যান্য সরকারের অবাধ স্বাধীনতা দৃষ্টিভঙ্গিতে কিনস বিস্মিত হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর Economic Consequence of the peace গ্রন্থে পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে অস্বাভাবিক, অস্থিতিশীল, জটিল ও অনির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করেন। প্রফেসর John Maynard Keynes[২২] এর জেনারেল তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তারল্যের অগ্রাধিকার (Liquidity preference) ভোগ, সঞ্চয় বা বিনিয়োগ রেখা নয়, বরং এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে এ্যাডাম স্মিথ থেকে শুরু করে সব ক্লাসিক্যাল ধারণা 'আপনা আপনি সব সময় পূর্ণ কর্মসংস্থান বিরাজ করবে ' তত্ত্বটিকে ভূল প্রমাণ করা। 'কিনসের' যুক্তি হলো মুক্তবাজার অর্থনীতি সব সময় পূর্ণ কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে না। এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দীর্ঘ সময় ধরে মন্দার কবলে পড়ে। মন্দার কবলে পড়া অর্থনীতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমৃদ্ধির যুগে ফিরে আসবে এ ধরনের বিশ্বাস কিনসের মতে ভুল। অর্থনৈতিক এ মন্দা থেকে উত্তরণের জন্য কিনস ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকার প্রস্তাব করে। ফলে ১৯৩০ সালের অর্থনৈতিক প্রলয়ংকারী মহামন্দা[২৩] পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সমূলে মূলোৎপাটন করে কল্যাণ রাষ্ট্রের সূচনা করে।[২৪]

আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের কার্যাবলি

অধ্যাপক গার্নার রাষ্ট্রের কার্যাবলি তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। প্রথমত মৌলিক বা একান্ত প্রয়োজনীয় কার্যাবলি যা প্রত্যেক রাষ্ট্রই করে থাকে। দ্বিতীয়ত, যে সব কাজ প্রয়োজনীয় নয় কিন্তু রাষ্ট্র সে গুলোর বিষয়ে উদাসীন থাকে না। তৃতীয়ত, ঐচ্ছিক কার্যাবলি। তবে অধ্যাপক গেটেল ও অধ্যাপক উইলোবি রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এক. মৌলিক বা মুখ্য কার্যাবলি, দুই. ঐচ্ছিক বা গৌণ কার্যাবলি। অপরিহার্য কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রে বসবাসরত জনগণের অধিকার সংরক্ষণ করা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আর. এম ম্যাকাইভার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজ বলেছেন।[২৫] জনগণের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার নিশ্চয়তা থেকেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। তাই রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা বজায় রাখা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ঐতিহ্যগত দিক থেকে আইন ও শৃঙ্খলার মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এবং শৃঙ্খলা রক্ষা হলো রাষ্ট্রের একটা মৌলিক দায়িত্ব। অধ্যাপক উইলোবি রাষ্ট্রের আয়ত্তে প্রচুর ক্ষমতা থাকার বলেছেন। যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাষ্ট্র বৈদেশিক হস্তক্ষেপ প্রতিহত করে স্বীয় অস্তিত্ব, জাতীয় জীবনকে সংরক্ষণ, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির নিরাপত্তাসহ অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে। [২৬] প্রথমত স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন অপরিহার্য। আর অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজন পুলিশ বাহিনী। এছাড়া নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র , জীবন ও সম্পত্তির উপভোগে কোন উপদ্র ও বিঘ্নে সম্মুখীন না হয় তার নিশ্চিত করা। নিজের সীমানার মধ্যে সর্বজনীন শৃঙ্খল অবস্থা রাখা, অন্যায়কারী ও দুস্কৃতকারীগণের শাস্তির বিধান ও পূর্ণাঙ্গ আইনের অনুশাসন নিশ্চিত করা জন্য শক্তিশালী বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগ প্রতিষ্ঠা। মানুষ যাতে এক অপরের সাথে সুন্দর সম্পর্ক নিয়ে বাস করতে পারে তার ব্যবস্থা করা, বিভ্রান্ত ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ করা, সুচারূপে জনসংযোগ পরিচালনা করা যাতে সকলের জীবন স্বাচ্ছন্দে কেটে যায়। প্রত্যেকটি জিনিস যেন তাদের যথাযথ স্থানে সঠিক দায়িত্ব পালন করে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করা । এ কাজ করার জন্য বল প্রয়োগের মাত্রা যেন কমে আসে সে উদ্দেশ্য সব কিছু নিজের দায়িত্বে টেনে নেয়াই হল প্রত্যেক রাষ্ট্রের কাজ। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রাষ্ট্রকে পরিচিত করা, রাষ্ট্রীয় ভূখন্ডে অবস্থিত সম্পদের ওপর দাবি প্রতিষ্ঠা করা, অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন, আঞ্চলিক জোট গঠন, বহির্বিশ্বে বাজার সৃষ্টি করা ও সম্প্রসারণ করা, বিদেশে অবস্থানরত দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা ও সেবা প্রদান করা ইত্যাদি রাষ্ট্রের কাজ । রাষ্ট্রের অর্থ ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় অর্থ সংগ্রহ ও বন্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলা রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য কাজ।

রাষ্ট্রের কল্যাণ কাজের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রের জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা। কেননা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ। শিক্ষিত নাগরিক তার অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের উদ্দেশ্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে গণমুখী করা, শিক্ষার ব্যয় হ্রাস করা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিকট শিক্ষাকে সহজলভ্য করা, শিক্ষাব্যবস্থাকে জীবনের উপযোগী করে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা মানুষের দোরগোড়ায় পৌছানো। জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও

স্বাস্থ্য রক্ষায় হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, শিশুসদন, মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। নিত্য নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠায় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের উৎসাহ ও ঋণ প্রদান, শিল্পজোন প্রতিষ্ঠা, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টি ও রপ্তানি জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করা। সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিভিন্ন ধরনের উদ্যেগ গ্রহণ। রাষ্ট্রে বসবাসরত দারিদ্র ও দু:স্থদের অন্ন, বস্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। বেকারদের বেকার ভাতা, কর্মহীনদের কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত সাহায্য করা, দরিদ্রদের জন্য স্বাস্থ্যবীমা, প্রবীন বৃদ্ধ নগারিকদের সংস্থান, দুর্ঘটনা কবলিতদের ভাতা, গৃহহীনদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, শিল্প ও বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষুদ্র শিল্প মালিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। এছাড়া বিদ্যমান বিভিন্ন বৈষম্য ও কুপ্রথা দূরীকরণ, জনগনের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য ও পণ্য যেমন চাল, ডাল, আটা-ময়দা, চিনি তেল ইত্যাদি সরবরাহ প্রক্রিয়া সচল রাখা, দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা, জনগণের মাঝে ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখা, জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করা। রাষ্ট্র জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, চলাচলের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করা। জনগণের রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার পরিবেশ সৃষ্টি, সংগঠন ও রাজনৈতিক দল গঠনের স্বাধীনতা, জনগণের বিপরীতমূখী স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সমাজের দূর্নীতির প্রতিরোধ ,ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংক্ষণ, শরণার্থীদের আশ্রয় দান। সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, রাষ্ট্রের বিশাল কর্মীবাহিনীকে পরিচালনা করা ও নিয়ন্ত্রণে রাখা, উন্নয়নমূলক ও জনহিতকর কাজ।

ইসলামী দৃষ্টিতে কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা

ইসলামী রাষ্ট্রই কল্যাণ রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রব্যবস্থা মূলত ইসলামী মূল আদর্শের আলোকে গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্র ও সরকার ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দুটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানবকল্যাণ সাধনের একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা।[২৭] পরিভাষা হিসেবে 'ইসলামী রাষ্ট্র' এর ব্যবহার বিংশ শতাব্দী থেকে শুরু । রাষ্ট্রের আরবি পরিভাষা হচ্ছে 'দাওলাহ'। পবিত্র কুরআনে 'দাওলাহ' শব্দের পরিবর্তে 'দুলাই 'শব্দের ব্যবহার হয়েছে।[২৮] ধাতুরূপ "দাওল" হতে "দাওলাহ" শব্দটি তিনটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথমত, রাজনৈতিক পরিবর্তন, দ্বিতীয়ত, চলমান রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ধারাবাহিকতা এবং তৃতীয়ত, জাতিরাষ্ট্র।[২৯] ইবনে খালদুনও রাষ্ট্রের পরিভাষা হিসেবে 'দাওলা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। প্রথম যুগের মুসলিম ফকিহগণ 'খেলাফত' বা 'ইমামত' শব্দদ্বয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা বোঝাতে ব্যবহার করেছেন। 'দাওলাহ' পরিভাষাটি হিজরি সপ্তম শতকের প্রথম দিকে বেশি প্রচলন হতে থাকে এবং ক্ষমতাহীন খলিফার নামেমাত্র আনুগত্যশীল মুসলিম রাজবংশসমূহকে আখ্যায়িত করতে ব্যবহৃত হয়।তবে খিলাফত শব্দের বিকল্প হিসেবে 'ইসলামী রাষ্ট্র' পরিভাষাটি প্রচলন লাভ করতে আরও আট শতাব্দী পেরিয়ে যায়।[৩০] পরিভাষায় কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক সংগঠিত এবং পরিচালিত আদর্শবাদী রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র। ড. খুরশিদ আহমদের মতে যে রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকান্ড ইসলামী আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত এবং যে রাষ্ট্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্ব ও প্রাধান্য মেনে নিয়ে সে মোতাবেক অভীষ্ট লক্ষ্য পৌঁছার সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো হয় তা-ই ইসলামী রাষ্ট্র। আল মাওয়ার্দীর মতে ,"দ্বীনের সংরক্ষণ, পার্থিব রাজনীতি এবং জনগণকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তাকেই ইসলামী রাষ্ট্র বলে।"[৩১] আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের আইন, শাসন ও বিচারব্যবস্থা গড়ে উঠে, যদি তা কুরআন, সুন্নাহের ভিত্তিতে তৈরি হয় তাহলে সে রাষ্ট্রকে বলা হবে ইসলামী রাষ্ট্র।"[৩২] মুহাম্মদ আসাদ বলেন, "একটা রাষ্ট্রকে তখনই ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায়, যখন সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিধানগুলো জাতির জীবনে সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং সে দেশের মৌলিক শাসন-সংবিধানে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়।"[৩৩] ইসলামী রাষ্ট্রকে আবার 'ফালাহী' বা কল্যাণ বলে আখ্যায়িত করা হয়।[৩৪] ফালাহ শব্দটি পবিত্র কুরআনে ৪০ বার ব্যবহার করা হয়েছে। এর সমার্থক শব্দ ফাউজ' পবিত্র কুরআনে ২৯ বার ব্যবহার করে ব্যক্তি মানুষের কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ও ভিন্নধর্মী কল্যাণ রাষ্ট্রের দিক নির্দেশনা পেশ করেছে। এ রাষ্ট্রে শরী'আহর মধ্যে থেকে নাগরিকদের জন্য কল্যাণময় জীবনধারণের জন্য যা যা প্রয়োজন সব কিছুই রয়েছে।[৩৫] কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য দুনিয়া ও আখিরাতের সামগ্রিক কল্যাণ।[৩৬] তাই ইসলাম কাজের কথা যেমন বলে তেমনি আমলের কথাও বলে। ইসলাম ব্যবসার কথা বলেছে, বলেছে সম্পদের ব্যাপক বিতরণের কথা, মানুষের অধিকারের কথা। এ ধরনের রাষ্ট্রের ভূমিকা হচ্ছে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষা করা, সম্পদের সুষ্ঠুবন্টন, অন্ন-বস্ত্র শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা। এ রাষ্ট্র জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের মৌলিক অধিকারের পুরোপুরি নিশ্চয়তা প্রদান করে।[৩৭]

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের বেশিষ্ট্য

ইসলাম তাঁর অনুসারীদের সামনে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য কতিপয় মৌলিক নীতিমালা পেশ করেছেন। ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ তা'আলা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। সার্বভৌম শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Sovereignty। এটি ল্যাটিন শব্দ Supernus থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং

ব্যুৎপত্তিগত অর্থে Sovereignty বা সার্বভৌমত্ব বলতে একক, অবিভাজ্য, নিরঙ্কুশ ও অবাধ ক্ষমতাকেই বোঝায়।[৩৮] কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ প্রকৃত সার্বভৌমত্বের মালিক নয়। আল্লাহ আসমান ও যমিনের সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তার রাজত্বে কোনো অংশীদার নেই।[৩৯] তিনি ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা সরকার তাঁর এ ক্ষমতার সামান্যতমও অংশীদার নয়।[৪০] তিনিই স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রণকারী ও পরিচালক। এই পৃথিবীতে মানুষ তাঁর প্রতিনিধি। আর এই প্রতিনিধির দায়িত্ব হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে পৃথিবীতে তাঁর শাসন ও বিধান বাস্তবায়ন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে মানো এবং আল্লাহর রাসূলকে ও তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে তাদেরকে মানো'।[৪১] যুগে যুগে আল্লাহর প্রতিনিধিগণ তাঁরই নির্দেশনা মেনে তাঁর আইন কার্যকর ও বাস্তবায়ন করেন। নবি রাসূলগণের পর এই প্রতিনিধির দায়িত্বপালন ভার ন্যস্ত হয়েছে উম্মতের ন্যায়পরায়ণ শাসকগণের উপর। মুসলিমদের মধ্যে থেকে যারা কর্তৃত্বে আছে তাদের কাজ হলো আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশনা অনুযায়ী শাসনকাজ পরিচালনা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ [৪২] অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম চলে না। আল্লাহ যেমন সৃষ্টিকর্তা তেমনি তিনি নির্দেশদাতা। অন্যত্র বলেন أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ "জেনে রেখো তারই জন্য সৃষ্টি এবং আদেশ। বরকমতময় আল্লাহ, যিনি বিশ্বজগতের রব"।[৪৩]

পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। শুরা বলতে পরামর্শ করা বোঝায়। কারো কাছ থেকে উত্তম ও কল্যাণ উপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এর মাধ্যমে ভালো ও মন্দ বিষয়ের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সহজ হয় । তাই শুরাকে কল্যাণ রাষ্ট্রের মূলভিত্তি বলা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে পরামর্শের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালিত হলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শরি'আহর আলোকে গৃহীত হয়। রাসুলুল্লাহ সা. স্বয়ং বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবিদের পরামর্শ নিতেন। তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ "এবং তাদের পারস্পরিক কাজ পরামর্শক্রমে করে।"[৪৪] অর্থাৎ তাদের সামাজিক বিষয়-কর্মাদি নিজেদের মধ্যে আলোচনার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া উচিত। আল কুরআনের এই নির্দেশ দ্বারা চূড়ান্তভাবে সমস্যার ফায়সালা করা হয়েছে।[৪৫] এর মাধ্যমে শরি'আহতে সম্পূর্ণ অনুল্লিখিত বহুবিদ শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হলে তাঁর অনুমতি দেয়া হয়েছে। জাতির সর্বোত্তম কল্যাণের স্বার্থে ইজতিহাদ তথা স্বাধীন যুক্তিবিচার প্রয়োগ করে খুঁটিনাটি বিধি-বিধান ও আইন প্রণয়নের দায়িত্ব সমাজেরই। ইসলামী রাষ্ট্রে সমাজ কর্তৃক নির্বাচিত একদল আইন-প্রণেতার ওপর অর্পিত হয় রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা। এই ভাবে আইন প্রণয়নের ফলে ব্যক্তিগত ঝোঁক বা প্রবণতা অনেক পরিমানে হ্রাস পায়। তাই ইজমাহ ও কিয়াসের আলোকে পারস্পরিক পরামর্শের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। শুধু তাই নয় কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর প্রশংসাও করা হয়েছে। শাসকের জন্য অজানা, জটিল, দ্বীনি বিষয়, জিহাদ পরিচালনা, প্রশাসন পরিচালনা সহ জনকল্যাণমুলক কাজে বিজ্ঞ আলেমদের সাথে পারমর্শ করা আবশ্যক। কেননা পরামর্শগ্রহণকারী কখনো লজ্জিত ও অপমাণিত হয় না। যে পরামর্শ ছাড়া নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করে এবং অটল থাকে সে প্রায়ই বিপদগামী হয়।[৪৬] রাসুলুল্লাহ সা. এঁর অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা এ জন্য কোমল ও নরম করে দিয়েছেন যেন তিনি রাগ বর্জন করে সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করেন। তাঁদের ভুলগুলো ক্ষমা করে দেন এবং প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করেন।[৪৭] ইবনে আব্বাস রা. এরঁ মতে সূরাহ্ আলে-ইমরানের ১৫৯ নম্বর আয়াতটি আবুবকর রা. ও উমর রা. এঁর সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাঁরা উভয়েই ছিলেন রসুলুল্লাহ সা. এর বিশেষ সহচর ও পরামর্শদাতা এবং মুসলমানদের অভিভাবক তুল্য। রাসুলুল্লাহ সা. সরাসারি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী পাওয়ার পরও তিনি সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ পেয়েছেন।[৪৮] রাসুলুল্লাহ সা. বদর যুদ্ধের বিষয়ে সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আনসারদের দেয়া মতামতকে গ্রহণ করেছিলেন। আহযাবের যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সা. হযরত সালমান ফারসীর পরামর্শ নিয়ে পরিখা খনন করেন।[৪৯]

ইসলামী রাষ্ট্র একটি বিশ্বজনীন রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদের কোন স্থান নেই। আধুনিক রাষ্ট্রের মূলভিত্তি হলো জাতীয়তাবাদ। জাতি রাষ্ট্র মূলত একক জাতিগত পরিচয় বা জাতীয় আদর্শকে ভিত্তি করে গঠিত রাষ্ট্রকে বোঝায়। সাধারণত জাতিরাষ্ট্রগুলোয় জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মননশীলতার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফরাসি বিপ্লবের পর একটি আদর্শিক রাষ্ট্রের ক্ষীণ আলো মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল, কিন্তু তা অচিরেই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের অন্ধ গহবরে তলিয়ে যায়। ইসলামী রাষ্ট্র একটি গোত্র কিংবা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় অথবা ভৌগোলিক আয়তনের মধ্যেও আবদ্ধ নয় বরং এটি বিশ্বজনীন রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্র এমন একটি রাষ্ট্র যা বংশ, বর্ণ, ভাষা এবং ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে শুধু নীতি আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসলাম সকল মানুষকে এক জাতি হিসেবে গণ্য করেছে। মানবতা তাদেরকে এক কাতারে একীভূত করেছে। কুরআনের মতে গোটা মানবকূল একই জাতি। সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভূক্ত ছিল। [৫০] জাতীয়তাবাদের সকল সংকীর্ণ ভাবধারা থেকে বের হয়ে নিরেট আদর্শিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।[৫১] ইসলামের মূলনীতি হলো পৃথিবীর সকল মানুষ সমান। এখানে কোন বংশবাদ, গোত্রবাদ কিংবা আঞ্চলিকতাবাদের স্থান নেই। মানুষের মাঝে

ইসলাম কোন বৈষয়িক বস্তুভিত্তিক কিংবা ইন্দ্রিয়গাহ্য পার্থক্য সমর্থন করেনি। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ একই মূল থেকে উদ্ভূত।[৫২] জাতীয়তাবাদ তাঁর সকল রূপ ও আবরণে ইসলামের এই মূলনীতির বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে। কুরআন যে বংশ বা জাতির কথা বলেছে তা কেবল পারস্পরিক পরিচিত লাভ ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন , يَآيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا "হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো।"[৫৩] ইসলামে কোন গোত্রপ্রীতির কোন স্থান নেই। গোত্র স্বার্থের কথা যে ঘোষণা করে, গোত্রের স্বার্থের জন্য যে লড়াই করে, গোত্র স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে যে মারা যায় সে রাসুলের দলভুক্ত নয়। আসাবিয়া বা গোত্রপ্রেম মানুষকে সুস্পষ্টভাবে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। এর মানে নিজ গোত্রকে অন্যায়ভাবে সাহায্য করা।[৫৪] রাসূল সা. সারা জীবন বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং এ নিয়ে যারা বিভাযন সৃষ্টি করে তাদের বিষয়ে কঠোর হুশিয়ারি বাক্য উচ্চারণ করেছেন। এ ব্যাপারো তাঁর বক্তব্য হলো, "জান্নাত ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আমার আনুগত্য করেছে, যদিও সে হাবসি ক্রীতদাস হয়। আর জাহান্নাম ঐ ব্যক্তির জন্য যে আমার অবাধ্য হয়েছে, হোক না সে কোন সম্ভ্রান্ত কুরায়শী বংশের নেতা।"[৫৫] স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বজনীন এই রাষ্ট্রটির শুরু হবে কোনো মহাদেশের নির্দিষ্ট এমন কোনো ভূখন্ড থেকে, যেখানকার জনগণ ইসলামকে তাদের জীবনবিধান হিসেবে মেনে নিতে রাজি হয়।[৫৬] আদর্শের ভিত্তিতে পৃথিবীর যেখানেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে তা নিশ্চিতভাবে ইসলামী রাষ্ট্র বলে বিবেচিত হবে। এ ধরনের একটি নিরঙ্কুশ আইন ভিত্তিক রাষ্ট্রের জন্য বিশ্বরাষ্ট্রে রূপান্তরিত হওয়ার কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।[৫৭]

কল্যাণ রাষ্ট্রের শাসকগণ মূলত জনগণের প্রতিনিধি। তাঁরা জনগণের বিষয়াবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল। তাই তাদের কাজকর্মের জন্য এবং দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে একদিকে যেমন আল্লাহর নিকট দায়ী হবে অপর দিকে জনগণের নিকটও দায়ী থাকবেন। আবুবকর রা. বলেন, "প্রজাদের জন্য শাসকের অবস্থা যাচাই এবং হিসেব নেওয়ার অধিকার রয়েছে।" তিনি আরো বলেন, "আমি ভালো কাজ করলে সহায়তা করবে।"[৫৮] ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব ,শাসন ক্ষমতা একটি অন্যতম আমানত।[৫৯] কিয়ামতের দিন তা লজ্জা ও অনুতাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অবশ্য যিনি ন্যায় ভিত্তিক নেতৃত্বের অধিকারী এবং যিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে থাকেন তাঁর কথা আলাদা । প্রতিটি মুসলিম দায়িত্বশীল ও তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন 'রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল আর প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম,যিনি জনগণের দায়িত্বশীল তিনি তাঁর অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল,সে তার অধীনস্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোন ব্যক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনো রেখো প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৬০] কেউ কারো কাজের দায়ভার বহন করবে না।[৬১] ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান নিষ্পাপ কিংবা পবিত্র কেউ নয় যে, সে জিজ্ঞাসাবাদ বা জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে থাকবে। রাষ্ট্রপ্রধানের পদমর্যাদা নিছক শ্রদ্ধার কিংবা সম্মানিত কোনো পদ নয় বরং এটি দায়িত্বের বোঝা বহনের পদ। খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রা. যখন এ পদে অধিষ্ঠিত হন তখন তাঁর প্রদত্ত ভাষণে বলেন, 'হে মানব সকল! আমিতো তোমাদেরই একজন। তবে আল্লাহ আমাকে তোমাদের থেকে বেশি বোঝা বহনের দায়িত্ব দিয়েছেন।' ইসলামী রাষ্ট্র যদি ইসলামী আইন ও সংবিধানের পথ থেকে সরে পড়ে তাহলে রাষ্ট্রের নাগরিকগণ রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য ও সহযোগিতা থেকে পিছপা হবে। রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, "মুসলমাদের দায়িত্ব হচ্ছে পছন্দ ও অপছন্দ সর্বাবস্থায় দায়িত্বশীলের আনুগত্য করবে যতক্ষণ না কোন গুনাহ কিংবা অপরাধজনিত কারো আনুগত্যের নির্দেশ দেয়। হযরত আবুবকর রা. খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম ভাষণে বলেন,' তোমরা ততক্ষণ আমার আনুগত্য করবে যতক্ষণ আমি আল্লাহর আনুগত্যের ওপর থাকি। আর যদি আমি আল্লাহর নাফরমানি করে থাকি তাহলে তোমাদের ওপর আমার আনুগত্যের কোন বন্ধন অবশিষ্ট থাকবে না। [৬২] একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই নিজেকে জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُوْنَ "তিনি যা করেন, তৎসম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।"[৬৩] আল মাওয়ার্দী (৯৭৪-১০৫৮খ্রি.) বলেন ,'যদি রাষ্ট্রপ্রধান বা খলিফা যথাযথভাবে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করেন তবে রাষ্ট্রপ্রধানের মতো গুরুত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত থাকার অধিকার তাঁর নেই।[৬৪]

রাষ্ট্রের সকল স্তরে ন্যায় ও ইনসাফের শাসন কায়েম করা একটি আদর্শবাদী কল্যাণ রাষ্ট্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁর মনোনিত বান্দাদেরকের জোড়ালো ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন। ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থা যাচাই-বাছাই না করে আবেগের বশবর্তী হয়ে ফায়সালা করলে অথবা কোনরূপ খেয়াল-খুশি, কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে বিচারের রায় দিলে নবিকেও আল্লাহর তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবেন।[৬৫]

কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত বিধি-বিধান ও আইন-কানুনের ভিত্তিতে জনগণের মাঝে শাসনকাজ পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতায় নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৬৬] এ কাজে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করা হলে সে কিয়ামতের দিন সে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হয়ে পড়বে।[৬৭] নিরপেক্ষ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা অনন্য। মুমিনদের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর নির্দেশের বাইরে কিংবা তাঁর প্রেরিত বিধানের বাইরে কোনো কিছুতেই সন্তুষ্ট হওয়ার পথ রাখেননি। তিনি তাঁর প্রদত্ত বিধানের বাইরে সবকিছু প্রত্যাখানের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে, " اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَىالطَّاغُوْتِ وَ قَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ وَ يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ''তুমি কি দেখোনি তাদের দিকে যারা দাবি করে যে নিশ্চয়ই তারা তোমার প্রতি অবতীর্ণ এবং তোমার পূর্বে অবতীর্ণ বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে, তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, অথচ এটাকে প্রত্যাখান করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়''।[৬৮] ইসলামের চোখে পৃথিবীর সকল মানুষ একই পিতা-মাতার সন্তান। তাই তাঁদের মধ্যে বংশ ও রক্তের দিক দিয়ে কোনরূপ পার্থক্য করে যেন বৈষম্য করা না হয়। এ সুবিচার নীতির পরিহার করার পরিণাম স্বেচ্ছাচারিতা ও নিপীড়ন-নিষ্পেষণ ছাড়া আর কিছুই নয়।[৬৯] শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে নয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যক। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে সকল প্রকার অর্থনৈতিক জুলুম মূলোৎপাটন করে শ্রেণিতে শ্রেণিতে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, অঞ্চলে অঞ্চলে সুবিচার কায়েম করা। ইসলামী অর্থনীতির সার্বিক উদ্দেশ্যই সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এ ছাড়া সম্পদের পূর্ণব্যবহার, জীবিকা অর্জনের স্বাধীনতা, বঞ্চিতদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটানো। এই সুবিচার নীতি কার্যকর করার দায়িত্ব রাষ্ট্র ও তাঁর জনগণের। তাই আদল প্রতিষ্ঠাকারী ও আদলের বিরোধীতাকারী সমান হতে পারে না। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সা. নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য নিঃশর্ত আহবান জানিয়েছেন। নিকটাত্মীয়দের হক আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "যদি তোমরা কাউকে শাস্তি দাও তাহলে ঠিক ততোটুকু শাস্তিই দেবে যতোটুকু অন্যায় তোমার সাথে করা হয়েছে; অবশ্য যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো তাহলে জেনে রেখো ধৈর্যশীলদের জন্যে তাই হচ্ছে উত্তম।"[৭০] রসুলুল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহ সেই উম্মাহ কে পবিত্র করেন না যারা ন্যায়বিচার করে না এবং সবলদের বাধ্য না করে দুর্বলের অধিকার আদায় সম্ভব হয় না।'[৭১] শাসন-প্রশাসনে পূর্ণ সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা নিরপেক্ষতা রক্ষা করা কর্তব্য। এ জন্য কুরআন ন্যায়বাদী-সুবিচারক শাসক নিয়োগের শর্ত করেছে এবং প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের সুষ্ঠু নীতি অনুসরণ তার জন্য ফরয করে দিয়েছে। কুরআন গোটা মানব জাতির প্রতি সুবিচার করার ঘোষণা দিয়েছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে কল্যাণ রাষ্ট্রের কাজ

সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির উচ্ছেদ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে করেছে সমাজের সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনের হাতিয়ার স্বরূপ। রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য যা ক্ষতিকর তা সমাজ থেকে উৎখাত করা। যেমন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সুদ ও জুয়া সমাজের জন্য ক্ষতিকর মনে করেই আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন। যাকাত অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কল্যাণকর হওয়ার কারণেই তা ফরজ করেছেন।[৭২] ইসলামী রাষ্ট্রের কাজই হলো ক্ষতিকর রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উপায় ও উপকরণ উৎখাত করে কল্যাণকর উপায় ও পন্থা কার্যকর করা। অন্যায় নির্মূল করার এ কর্মসূচী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।[৭৩] এই উম্মতকে আল্লাহ সৃষ্টিই করেছেন সৎকাজের আদেশ দিতে ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ "তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাহ, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উত্থান করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে আর অসৎকাজের নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।"[৭৪] মুসলিম সমাজের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য সত্যবাক্য উচ্চারণ করবে, নেক ও কল্যাণের সহায়তা করবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের যেখানেই কোন ভুল বা অন্যায় কাজ হতে দেখবে সেখানেই তাকে প্রতিহত করতে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা করবে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই এ দায়িত্ব পালন করা অপিরহার্য। রসুলুল্লাহ সা. অন্যায় কাজ দেখলে প্রথমে তা শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিরোধ করতে বলেছেন। এরপর অপারগ হলে উপদেশ দিয়ে এবং সর্বশেষ আন্তরিক ঘৃণার মাধ্যমে তার বিরোধিতার নির্দেশ দেন।[৭৫] আল্লাহ তায়া'লা বলেন, "আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি, যাতে করে তোমরা এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করো এবং আল্লাহ তা'আলার বিরোধী শক্তিসমূহকে বর্জন করো।[৭৬] আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে উত্তম কাজে একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছেন এবং অন্যায় ও নিষিদ্ধ কাজ পরিহার করে আল্লাহকে ভয় করে চলার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,' وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ "তোমরা পরস্পর সৎকর্ম ও তাকওয়া অবলম্বনে এক অন্যকে সাহায্য করো। আর তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনে এক অপরকে সহায়তা করো না।"[৭৭] রসুলুল্লাহ সা. বলেন, "অত্যাচারী হোক কিংবা অত্যাচরিত হোক তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য করো। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো হে আল্লাহর রাসুল! অত্যাচারীতকে

সাহায্য করার অর্থ তো বুঝলাম, কিন্তু অত্যাচারীকে সাহায্য করার অর্থ কী? রসুলুল্লাহ সা. বললেন, "তাকে অত্যাচার করা থেকে বাঁধা দেয়া এবং বিরত রাখা। এটাই হলো তাকে সাহায্য করা।"[৭৮] মুসলিম সমাজের প্রতিটি সদস্যের এটি শুধু অধিকারই নয়; বরং অপরিহার্য কর্তব্য।

কল্যাণ রাষ্ট্রের কাজ হলো রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার নির্বিঘ্নে চলাফেরা করা। বিশ্বজনীন শান্তি সম্প্রীতির পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা একমাত্র ইসলামই নিশ্চিত করে। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জান মাল ও ইজ্জত আবরুর হেফাযত করে। ইসলাম মানব সমাজে যে কোন ধরনের সংঘাত, হানাহনি, মারামারি, নাশকতা, বিশৃঙ্খলা, উগ্রতা, বর্বরতা ও প্রতিহিংসা নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا "তোমরা পৃথিবীতে শৃঙ্খলা স্থাপনের পর তাতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করো না। তাঁকে আহবান কর ভয় ও আশা সহকারে"।[৭৯] ইসলামের এ সকল মৌলিক অধিকারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জীবন সংরক্ষণ। ন্যায় সঙ্গত কারণ ও প্রক্রিয়া ছাড়া অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সে প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ হারাম করেছে; কিন্তু ন্যায়ভাবে। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দান করেছি। অতএব, সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করে। নিশ্চয়ই সে সাহায্য প্রাপ্ত।"[৮০] ব্যক্তি,পরিবার ও সমাজ জীবনে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত ও সহিংসতা ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলা, হানাহানি ও সন্ত্রাস দমনে ইসলাম কঠোর দিক নির্দেশনা দিয়েছে এবং সন্ত্রাসী দুর্বৃত্তদের প্রতিরোধে কঠিন শাস্তি আরোপ করেছে। ইসলামের আলোকে যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে ন্যায়বিচার করা হয়, তাহলে আর কেউ নাশকতা, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার সাহস পাবে না। পবিত্র কোরআনে ইচ্ছাকৃত হত্যাকান্ডকে মহা অপরাধ সাব্যস্ত করে কঠোর শাস্তির বিধান ঘোষিত হয়েছে আল্লাহ তা'আলা বলেন,وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا "যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো মুসলমানকে হত্যা করল, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।"[৮১] ইসলাম মানবতা বিরোধী সব ধরনের অন্যায় হত্যাযজ্ঞ,রক্তপাত, অরাজকতা ও অপকর্ম প্রত্যাখান করেছে। পাশাপাশি সৎকর্মে সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছে এবং জুলুম-নির্যাতনমূলক কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছে। জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চেতনা ও অর্থনৈতিক দর্শন ও অপরাধ দমন কৌশল ইসলামকে দিয়েছে সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা।

কল্যাণ রাষ্ট্রের মূল কাজ হলো সালাত প্রতিষ্ঠা করা। সালাত আদায়কারী আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। আল্লাহ তা'আলার প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্য ও বিনয় প্রকাশের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে সিজদা করা। আর সালাত আদায়কারী সিজদারত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয়।[৮২] সালাত আল্লাহ তা'আলা এবং বান্দার মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করে। ব্যক্তির অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে সালাত প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে শৃঙ্খলিত এবং সুসংগঠিত জীবনে অভ্যস্ত করে তোলো। এ কথা সুস্পষ্ট যে রাষ্ট্রের পক্ষে শুধু আইন ও বল প্রয়োগ করে নাগরিকদের নিয়ম-নীতির আওতায় আনা সম্ভব নয়। প্রয়োজন আত্মিক পরিশুদ্ধি ও মানসিক প্রশিক্ষণ। আত্মিক পরিশুদ্ধির কার্যকর পন্থা হলো মানুষের মনে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়ে সকল কাজকর্মের জবাবদিহির অনুভূতি সৃষ্টি করা। আর এই ভয় ও অনুভূতি মানুষকে সকল প্রকার অনৈতিক কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখে। এই চিন্তা মানুষকে ভালো নাগরিক বানায় ও তাঁর সকল কাজকর্ম নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন রাখে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীলতা ও মন্দাচার থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ সর্বাধিক বড় বিষয়। আর যা কিছু তোমরা করো তা আল্লাহ খুব ভালো জানেন।"[৮৩] এ জন্য নামাজ দুর্নীতি জুলুম নির্যাতন সহ সব অনৈতিক কাজ থেকে বিরত রাখে ও পুণ্যকাজে উৎসাহিত করে। সালাত সমাজে ঐক্য, শান্তি, শৃঙ্খলা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। জামা'আতে ধনী-গরিব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সবাই একই সারিতে দাঁড়িয়ে ঐক্যের বীজ বপন করে সাম্য প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হয়। এ কারণেই আল কুরআনে রাষ্ট্র পরিচালনায় মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্যে সবার আগে সালাত প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছেন।[৮৪] রাসুলুল্লাহ সা. সাহাবায়ে কেরামের দীক্ষার বেলায় সবার আগে রেখেছেন সালাতকে। সর্বদা নিজে ইমামতি করেছেন এবং জীবন-পরিক্রমার সর্বশেষ দিন নিজে ইমামতি করতে পারছিলেন না, কিন্তু সিদ্দিকে আকবর রা. এর নেতৃত্বে মানুষকে নামাজ পড়তে দেখে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। খোলায়ে রাশেদিন নিজেরা নামাজের ইমামতি করতেন। রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে নামাজের ইমামতির বিষয়টি এমন আবশ্যিকভাবে জড়িয়ে গেছে যে তাঁদের পদবিও ইমামত নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। নামাজের ইমামতিকে ছোট ইমামত এবং রাষ্ট্রের নেতৃত্বকে বড় ইমামত বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।[৮৫]

মানব জীবনের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অপরিহার্য। সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অন্যতম প্রধান। যাকাত ইসলামী অর্থ ব্যবস্থাপনার মূল ভিত্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্থ ও বঞ্চিতদের অধিকার।"[৮৬] যাকাতকে কেন্দ্র করেই সম্পদের সুষম বন্টন, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের কর্মপদ্ধতি পরিচালিত হয়। যাকাত দরিদ্র, অভাবী ও অক্ষম জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়। এর উদ্দেশ্যে

অভাবগ্রস্থ, দুর্দশা গ্রস্থ মানুষের অভাব দূর করে অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন করা। এ কারণে যাকাতকে বলা হয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার। এর হকদার হচ্ছে কর্মক্ষমহীন এবং যারা কর্মক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উপার্জহীন বা পর্যাপ্ত উপার্জন করতে পারে না। [৮৭] রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের অভাবী, গরীব, মিসকিন, এতিম, বিধবাসহ অসহায় ও পিছিয়ে পড়া মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান। রাষ্ট্রের দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে জনকল্যাণমূলক কাজের যাবতীয় খরচ সরবরাহ করা হয়। এর ফলে যাকাত ধনী দরিদ্র্যের মাঝে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। রসুলুল্লাহ সা. যাকাতকে ইসলামের সেতুবন্ধন বলে আখ্যায়িত করেছেন। যাকাতের অর্থ দিয়ে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা যায়। যাকাত প্রদানের কারণে সম্পদ কোথাও পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে না। অগণিত মানুষের হাতে পৌঁছে যায় যাকাতের সম্পদ। তাঁরা তাদের চাহিদা পূরণে তা ব্যবহার করতে পারে এবং তাঁরা প্রাপ্ত অর্থ সম্পদ বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ করতে পারে। বিনিয়োগের কারনে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে না বরং এর মাধ্যমে সম্পদ বাড়ে। ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব সরকারের।[৮৮] রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রসুলুল্লাহ সা. রাষ্ট্রের জনগণের মাল থেকে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। যাকাতের গুরুত্ব বুঝাতে আল্লাহ তা'আলা অনেক আয়াত নাযিল করেন। কোন ফাঁকফোকর দিয়ে যেন রাষ্ট্রের জনগণ বের হয়ে যেতে না পারে সে বিষয়ে রয়েছে কঠোর নির্দেশনা। যাকাত দেয়ার ফলে সম্পদ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়। মুশরিকদের জন্যে রয়েছে ধ্বংস, তারা যাকাত দেয় না' [৮৯] আল্লাহ বলেন, "তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। [৯০] যাকাত আদায় রাষ্ট্রীয়ভাবে বাধ্যতামূলক করা হলে এর মাধ্যমে বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাস ও স্বনির্ভরতা করা সম্ভব।

মানব জাতি পাশ্চাত্য নেতৃত্বে বিগত তিনশ বছরে চারটি প্রধান অর্থনৈতিক মতাদর্শের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। সেগুলে যথাক্রমে পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদী, ফ্যাসিবাদ ও কল্যাণ রাষ্ট্র। এসব মতবাদ মৌলিকভাবে একই ধারা থেকে উৎসারিত যে মানুষের অর্থনৈতিক সমাধানের ক্ষেত্রে ধর্ম ও নৈতিকতা প্রাসঙ্গিক নয়। বরং অর্থনৈতিক বিষয়াদি অর্থনৈতিক আচরণের সূত্র দ্বারাই সামাধান কারা যায়। এ ক্ষেত্রে নৈতিক ও সামাজিক বিধি বিধান প্রযোজ্য নয়। পুঁজিবাদ তাঁর সৌধ নির্মাণ করেছিল বল্গাহীন ব্যক্তিমালিকানাধীন বাজার ব্যবস্থার নীতির উপর। সমাজতন্ত্র মানবজাতির সুখ-সমৃদ্ধি খুঁজেছিল রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সামাজিক প্রণোদনা ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির উপর। এ দু'য়ের সমন্বয়ে ফ্যাসিবাদ রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও সামরিক উচ্চাভিলাসের জন্ম দেয় রাষ্ট্রীয় পুজিঁবাদের ছত্রচ্ছায়ায়। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মিশ্রঅর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত হয় কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা। এসব অর্থনৈতিক মতবাদে কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য পরিলক্ষিত হলেও তা মানবজাতির প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। সর্বশেষ পতন হয়েছে সমাজতন্ত্রের। আর সমাজতন্ত্রের এই ব্যর্থতা পুঁজিবাদ ও কল্যাণ রাষ্ট্রের যথার্থতা প্রমাণ করে না। [৯১] দক্ষ ও ন্যায়ভিত্তিক বন্টন ব্যবস্থাপনা সমাজের বিশেষ কোনো শ্রেণির জন্য নয় বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য নিশ্চিত করা। এর জন্য প্রয়োজন এমন একটি কৌশল গ্রহণ যার মাধ্যমে সমাজের বেকারদের কর্মসংস্থাণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে দৃশ্যমান দরিদ্রতা হ্রাস পায়। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়। আয় ও সম্পদ বন্টনে বৈষম্য হ্রাস পায়। এ ক্ষেত্রে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থাও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, উৎপাদন ও সংগঠন পদ্ধতি ভিত্তিক। উৎপাদন, সংগঠন পদ্ধতি ও প্রযুক্তিবিদ্যা যে কোন অর্থনীতিতে সমভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। মূল্যবোধ ও মূলনীতির দৃষ্টিকোন থেকে এ অর্থব্যবস্থা অন্যান্য অর্থব্যবস্থা থেকে আলাদা। মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে অবাধ স্বাধীনতা পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট এবং সামাজিক মালিকানা সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট বলে মনে করা হয়। ইসলামী অর্থনীতির কয়েকটি মূলনীতি হলো সুদনিষিদ্ধকরণ,[৯২] সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি, দুস্থদের জন্য সামাজিক ব্যবস্থা, ইসলামী মিরাস ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা। সুনীতির প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতির প্রতিরোধ তথা আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার সমকালীন সব অর্থনৈতিক জুলুম ও অনাচার প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে।[৯৩] জীবনের সকল বিষয়ে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠান নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে শক্তভাবে উল্লেখ করেছেন। অর্থনীতিতেও এ সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ফলে জুলুম ও অনাচার নির্মুল হয়। কাজেই ধনী-গরিব, কৃষক -শ্রমিক সকলের প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠার জোর নির্দেশ রয়েছে। এ দায়িত্ব যেমন রাষ্ট্রের তেমনি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক সুবিচার পাওয়া মৌলিক অধিকার। আর ইসলামই কেবলমাত্র এ সুবিচার নীতি প্রতিষ্ঠার মৌলিকত্ব পেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ন্যায় ভিত্তিক বিচার করতে, আমানতসমূহ তাঁর মালিকের কাছে ফেরত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৯৪] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ন্যায়পরায়ণতা, উত্তম আচরণ ও আত্মীয়স্বজনকে দান করার আদেশ দিয়েছেন। এ বিধান প্রতিষ্ঠার ফলে অর্থনীতিতে অভাবগ্রস্থ, দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের অভাব দূর করে অর্থনৈতিক ভিত সুদৃঢ় কার সম্ভব।[৯৫] ইসলাম বিস্তারের পর সম্পূর্ণরুপে বেকারত্ব দূর হয়ে দারিদ্র্য উৎখাত হয়েছিল। ঐতিহাসিক ভাবে দেখা যায় এমন সময় পার হয়ে গেছে যখন যাকাত নেয়ার লোক ছিল না। বর্তমানে এ দাবি আধুনিক রাষ্ট্র করতে পারে না যে সাহায্য নেয়ার কেউ নেই। ইসলামের ইতিহাস অনেক গৌরবোজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ যে দারিদ্র্য দূর করতে সক্ষম হয়েছি।[৯৬]

আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্র ও ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্রের মধ্যে তুলনামুলক পর্যালোচনা

রাষ্ট্র হলো এমন সংঘ যা সরকারের ঘোষিত আইন অনুসারে কাজ করে। সরকার আইন ঘোষণা করবার ও তা পালন করবার শক্তিধর। ঐ শক্তির সাহায্য সরকার নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের মধ্যে অবস্থিত সমাজে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখে।[৯৭] আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্র, উভয় ধারণাই মানব সমাজের জন্য কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত। তবে উভয় রাষ্ট্রের উৎস,নীতি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা মূলত ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে বিকশিত হয়। আর ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামের মূলনীতি ও শরি'আতের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হলো জনগণের সার্বভৌমত্ব। আইন ও শাসনের উৎস হলো সংবিধান যা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রণীত হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হলো শরি'আহ যা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত। রাষ্ট্র পরিচালনা, নীতি-নির্ধারণে, প্রশাসন ও আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ ও রীতি-নীতি পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করা হয়। রাষ্ট্রের সকল কর্মকান্ড ইসলামী আইন দ্বারা পরিচালিত হয়, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও প্রাধান্য মেনে নিয়ে সে লক্ষ্যে পৌঁছার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়।[৯৮] এ ধরণের রাষ্ট্রব্যবস্থা শরি 'আর নির্ধারিত পন্থায় মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ সাধন নিশ্চিত করে।[৯৯]

আধুনিক রাষ্ট্রের উৎপত্তি ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে জাতি রাষ্ট্র উত্থানের মধ্যে দিয়ে। যা মূলত রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের স্থলে প্রজাতন্ত্রের ধারনা নিয়ে এসেছে। ইউরোপীয় রেঁনেসাও আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আধুনিক রাষ্ট্র, আধুনিক পূর্ব রাষ্ট্র অনেক দিক থেকেই আলাদা এবং পার্থক্য সৃষ্টিকারী একটি রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের চিরাচরিত উপাদানের সার্বভৌমত্ব, নাগরিকত্ব, প্রতিনিধিত্ব, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবাধিকারের মতো অনেক উপাদান যোগ হয়েছে।[১০০] অন্যদিকে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক সংগঠিত ও পরিচালিত আদর্শবাদী রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র। আল কুরআনেই প্রথম রাষ্ট্র হিসেবে 'মূলক' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।[১০১] বিশেষ করে হযরত দাউদ আ., হযরত সোলায়মান আ., হযরত ইউসুফ আ., হযরত মুহাম্মদ সা. সহ অনেক নবি-রাসূলদের রাষ্ট্রক্ষমতার বিষয়টি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে। তাঁরা প্রত্যেকেই রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সা. মক্কা হতে মদিনা হিজরতের (৬২২ খ্রি.) পর সেখানে তিনি নেতৃত্বের আসেন প্রতিষ্ঠিত হয়ে একটি আনুষ্ঠানিক ইসলামী রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিতা করেন।[১০২] পরে খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলে (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) ক্রমবিকাশ লাভ করে একটি উন্নত শাসনব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়। [১০৩] তাই ইসলামের সাথে রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে নৈতিক ও আদর্শিক রাষ্ট্র যা সঠিক নিয়ম-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রীয় নিয়ম-নীতি ও আদর্শের সাথে এ রাষ্ট্র আপোষহীন। অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক, শত্রু-মিত্র ও যুদ্ধাবস্থাসহ যেকোন অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এই রাষ্ট্র তার মূলনীতি হারিয়ে ফেলেন না। এ রাষ্ট্র সৎ চরিত্রবান ও ন্যায়বান শাসকের প্রতিনিধিত্বে পরিচালিত হয়। এ রাষ্ট্র মানবতার প্রতিনিধিত্ব করে । ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় যার একমাত্র লক্ষ।[১০৪] এ বিষয়ে বিভ্রান্তির মূল কারণ মুসলিম জাহানে প্রাশ্চাত্যের সেক্যুলার চিন্তা ধারার আধিপত্য।[১০৫]

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সার্বভৌমত্বকে একটি রাষ্ট্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গণ্য করেছে। সার্বভৌমত্বহীন কোন দেশ রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না।[১০৬] সার্বভৌম শব্দ দ্বারা রাষ্ট্রের চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়। সার্বভৌম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠনের পূর্ণতা পায়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা মূলত মানুষের নিরঙ্কুশ শাসন। এ সার্বভৌমত্বের বলেই মানুষ দুনিয়াতে মানুষের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। এ শাসন ব্যবস্থা মূলত জনগণের শাসন, জনগণের দ্বারা, জনগণের উপর শাসন বলা হয়। জনগণের রায় ও সমর্থনেই একটি শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠে ও শাসন কার্য পরিচালনা করে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ ও সমগ্র সৃষ্টিলোকের জান-মাল সহ সবকিছুর মালিক আল্লাহ। প্রকৃতপক্ষে এই সার্বভৌমত্ব নিষ্পন্ন হয় মালিকানা থেকে। তাই ইসলাম যখন আসমান ও যমিনে যা কিছু আছে তার ওপর আল্লাহর মালিকানার প্রবক্তা তখন ইসলাম যে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকেও আল্লাহর মালিকানার প্রবক্তা হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ বলেন, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ অর্থাৎ আদেশ ও হুকুম ফায়সালা দানের নিরঙ্কুশ এখতিয়ার আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নয়।[১০৭] তাঁর শাসনের কোন শরিক নেই আর যেন কাউকে শরিক করা না হয়। তিনি আরো বলেন, "আর তোমরা এ ব্যাপারে যে কেনো মতভেদ করো, ফয়সালা দেবেন একমাত্র আল্লাহ।" [১০৮] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, "সাবধান ! সৃষ্টি তাঁরই এবং এর ওপর প্রভূত্ব চালানোর এবং শাসন করার অধিকারও একমাত্র তাঁরই। [১০৯] রাসুলুল্লাহ সা. বলেন , "আল্লাহই হলেন কেবল শাসক। শাসন করার অধিকার শুধু তাঁরই।[১১০]

আধুনিক গণতেন্ত্রর যাত্রা শুর হয় ষোড়শ শতাব্দীতে।[১১১] যার মাধ্যমে পশ্চিমা সভ্যতা নিরঙ্কুশ রাজনীতি ও অভিজাততন্ত্রের ক্ষমতা ভেঙে নাগরিক অধিকার রাজনীতিতে প্রবেশ করে। ইসলামেও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, পরিবর্তন, পরিচালনা সম্পূর্ণভাবে জনগণের রায় অনুযায়ী হতে হবে। অধিকাংশের এ নীতি তথা গণতন্ত্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্র একমত।[১১২] রাসুল সা. ও খুলাফায়ে রাশেদা গণতন্ত্রের এ নীতি অনুযায়ী কার্যকর শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণ লাগামহীন হবে না। এ রাষ্ট্রের আইন-কানুন, জনগণের জীবন-যাপনের মূলনীতি, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি ও রাষ্ট্রের উপায় উপকরণ সবকিছুই জনগণের ইচ্ছানুযায়ী হতে হবে তা নয়; বরং আল্লাহ ও রাসূলের উর্ধ্বতন আইন ও নিয়ম-নীতি সবক্ষেত্রে কার্যকর হবে। এ রাষ্ট্রব্যবস্থায় দলীয় একনায়কতন্ত্র, বংশীয় একনায়কতন্ত্র, এবং ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্রের স্থান

নেই। রাসুলুল্লাহ সা. নিজে তাঁর পরে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি কে এটা জানা সত্ত্বেও খলিফা নিযুক্ত করে যাননি। তিনি এ দায়িত্ব সাহাবিদের উপরই অর্পণ করে যান। ইসলামী রাষ্ট্রগঠন, রাষ্ট্রপ্রধান ও আইন পরিষদ গঠন ইত্যাদি সবকিছুই নির্বাচনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।[১১৩] খুলাফা রাশিদুন রা. এর প্রত্যেকেই জনগণের রায় ও সম্মতি নিয়েই খিলাফতের সুমহান দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামের প্রথম খলিফা আবুবকর রা. জনগণের রায়ে তো বটেই, বলতে গেলে জনতার একান্ত চাপেই খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১১৪] যে কোন মুসলিম নাগরিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সুচারুরূপে পালন করার যোগ্যতা রাখে। জনগণই নির্বাচন করবে কারা তাদের পরিচালনা করবে এবং কারা তাদের শাসক হবে। জনগণের মতামতকে পদদলিত করে তাদের অপছন্দনীয় কাউকে শাসক মনোনিত করা হবে না কিংবা তাদের অপছন্দনীয় কোনো শাসন ব্যবস্থা তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। সাথে সাথে শাসক যদি ভুল করে, তাহলে তা পর্যালোচনা করার অধিকার জনগণের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।[১১৫]

আধুনিক রাষ্ট্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই আইন প্রণয়নসহ শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োজনবোধে প্রচলিত আইনের সংশোধন বা রদবদল করে থাকে। আধুনিক রাজনীতিতে অধিকাংশ দেশে আইন বিভাগের একটি অংশকে পার্লামেন্ট এবং কিছু দেশে মজলিসে শুরা নামে অভিহিত করা হয়।[১১৬] নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে কিংবা কোনো ক্ষেত্রে মনোনিত সদস্যদের নিয়ে এটি গঠিত হয়। আইনসভায় প্রণীত আইন রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মতি লাভের পর কার্যকর হয়। ইসলামী রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নের একমাত্র মালিক আল্লাহ। আল্লাহর আইন অমান্যকারীকে কুরআনে খেয়ানতকারী, দুস্কৃতকারী ও বিদ্রোহী বলে নিন্দা করা হয়েছে।[১১৭] ইসলামী আইনের সরাসরি উৎস কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআনে শরি'আহ বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহর একক আধিপত্যের স্বীকৃতি দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,'' বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর।''[১১৮] অন্যত্র বলা হয়েছে, ''সব বিষয় আল্লাহরই অধিকারে।''[১১৯] এর পাশাপাশি ইজতিহাদ, ইজমাহ ও কিয়াস আইনের উৎস বলে বিবেচিত। আর মানুষ আল্লাহর আইনের বাস্তবায়নকারী।[১২০] মানুষ আল্লাহর নির্দেশনা প্রচারে,তা প্রতিষ্ঠাকরণে, বাস্তবায়নে, সমাজ জীবনে সমন্বিতকরণে এবং এর মর্ম অনুধাবনে আল্লাহর প্রতিনিধিস্বরূপ।

ইসলামী সরকারের মূল দায়িত্ব হলো সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। শত্রু-মিত্র, আত্মীয়-অনাত্মীয়, শাসক-শাসিত নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য আইনের বিধান সমভাবে প্রযোজ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,'হে ইমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো, আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষদান করো, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চাইতে বেশি। অতএব তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করে না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলো কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পর্কে অবগত।[১২১] আধুনিক রাষ্ট্রে বিচারকের রায়কে প্রভাবিত করা যেন নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে পাশ কেটে বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে এর কোন সুযোগ নেই। স্বয়ং নবিকে সা. আল্লাহ তা'আলা শক্তভাবে নিষেধ করেছেন যেন কোনভাবেই ন্যায়বিচার করতে গিয়ে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ যেন করা না হয়। যদি করা হয় তাহলে তাঁকে পরকালে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।[১২২] এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে সমাজের সকল শ্রেণির নাগরিক আইনের চোখে সমান।[১২৩] বিচারকের কাজ হলো নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী ন্যায়বিচার করা, পারস্পরিক বিবাদের মিমাংসা করা। পাশাপাশি যারা বিচারকাজকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে ন্যায় বিচারে বাধাঁ দিতে চায় তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[১২৪]

জাতি ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পূরণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের কাজ। বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক চলিত অর্থব্যবস্থা হলো পূঁজিবাদ। পুঁজিবাদে ব্যক্তির অর্থনৈতিক উদ্যোগ নেবার স্বাধীনতা ও মালিকানা স্বীকৃত। সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও উৎপাদনের নীতি। ষোড়শ শতাব্দী থেকে আজ অবধি পুঁজিবাদ যে দুনিয়াতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেনি তা বলার অবকাশ নেই। তেমনি একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে পুজিঁবাদ বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য, অসমতা দূর করতে পেরেছে। কাজেই পুঁজিবাদ দোষমুক্ত বা সমস্যামুক্ত এটা যেমন অতীতের ক্ষেত্রে বলা যায় না, তেমনি আজকেও বলা যায় না।[১২৫] বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন,'পুজিঁবাদ ও মজুরি প্রথা অবশ্যই অবসান ঘটাতে হবে। এদের জায়গায় এমন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে যা লুণ্ঠনলিপ্সাকে দমন করবে এবং বিলুপ্ত করে দেবে সেই অর্থনৈতিক অবিচার যার ফলে কেউ কেউ আজ আলস্যের মধ্যে দিয়ে দিন কাটিয়েও ধনী হবার সুযোগ পাচ্ছে আর সবাই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি করেও দারিদ্রের জ্বালায় ভুগছে। তিনি আরো বলেন,'পুঁজিবাদ ও মজুরিপ্রথা অসংখ্য অভিশাপের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হলো এর দ্বারা লুণ্ঠন লিপ্সা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অর্থনৈতিক অবিচার অনুমোদিত থাকছে এবং মালিক বা বিনিয়োগকারীর শোষণ-নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার সব সুযোগ থাকছে। কেননা স্বল্পসংখ্যক সুবিধাভোগী লোক কিছু উৎপাদন না করেও বিলাসবাসনে দিন কাঠাতে পারে।''[১২৬] পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র এবং কল্যাণ অর্থনীতির মতো বিভিন্ন অর্থনৈতিক মতাদর্শের জন্ম ও বিকাশ মূলত পশ্চিমা দেশগুলোতে ঘটেছে। এর ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে খ্রিস্টীয় নীতিশাস্ত্র বা নৈতিকতা। কারণ এই মতবাদগুলো যে সমাজে বিস্তার লাভ করেছিল, তা মূলত খ্রিস্টান সমাজ ছিল। আঠারো শতকে যে যুক্তিবাদী আন্দোলন দেখা যায়, তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাব। এই

আন্দোলনের প্রভাবে বস্তুতপক্ষে সেক্যুলারিজম প্রাধান্য লাভ করে এবং সমাজ ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে ওঠে। ফলে নৈতিকতার গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং যুক্তিবাদ প্রধান হয়ে ওঠে। এর ফলস্বরূপ ভোগবাদ, ব্যক্তিবাদ এবং স্বার্থপরতার মতো বস্তুবাদী ধারণাগুলোর জন্ম হয়। পুঁজিবাদের প্রভাবে সামাজিক ডারউইনিজমের সৃষ্টি হয়, যার মূল প্রতিপাদ্য ছিল অর্থনীতিতে কেবল যোগ্যরাই টিকে থাকবে। সহজভাবে বললে, বিশ্ব অর্থনীতি ধনীদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হবে এবং দুর্বলরা প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে বিলুপ্ত হবে। আঠারো শতকের যুক্তিবাদী আন্দোলনের প্রভাবে এই ধরনের পরিণতি দেখা গিয়েছিল। পুঁজিবাদী তত্ত্বের কিছু মৌলিক ধারণা ছিল বেশ ক্রুটিপূর্ণ। প্রথমত, তারা মনে করত অর্থনীতির নিয়মগুলো প্রাকৃতিক নিয়মের মতো অপরিবর্তনীয়। কিন্তু তাদের এই ধারণা ভুল ছিল, কারণ বাজারের গতিপ্রকৃতি সদা পরিবর্তনশীল, যা সৌরজগৎ বা প্রাকৃতিক নিয়মের মতো স্থির নয়। দ্বিতীয়ত, তারা বিশ্বাস করত মানুষের কর্মের একমাত্র চালিকাশক্তি হলো স্বার্থপরতা। তাদের মতে, মানুষ স্বভাবতই স্বার্থকেন্দ্রিক এবং নিজের স্বার্থ উদ্ধার করাই তার সকল কর্মের মূল প্রেরণা। কিন্তু পুঁজিবাদের এই ধারণাও সত্য নয়, কারণ মানুষ যদি কেবল স্বার্থপরই হতো, তাহলে পৃথিবীতে এত ত্যাগ ও উৎসর্গ দেখা যেত না।[১২৭] তৃতীয়ত, পজিটিভিজম অর্থাৎ অর্থনীতিতে কোনো মূল্যবোধ নেই। অর্থনীতিতে মূল্যবোধ এলেই অর্থনীতি প্রভাবিত হয়ে যাবে। পুঁজিবাদের এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা মূল্যবোধের স্থান আছে বলেই দরিদ্রদের ও বঞ্চিতদের জন্য কাজ করা হয়। চতুর্থত, পুঁজিবাদ বাজার ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করে। বাস্তবে বাজার ব্যবস্থাপনা মাধ্যমে পুরোপুরি সম্পদের সঠিক বন্টন হয় না। তাঁর প্রমান আমাদের দেশের জনগণের একটা অংশের হাতে প্রয়োজনীয় ক্রয় ক্ষমতা না থাকায় তারা কিনতে পারছে না। কেননা আমাদের অর্ধেকের বেশি লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। তারা অর্থের অভাবে প্রয়োজনীয় জীবন সামগ্রী কিনতে পারে না বলে তাদের প্রয়োজনটা মার্কেটে যায় না। সুতরাং বাজার ব্যবস্থাপনা সঠিক পদ্ধতির নয় যার মাধ্যমে সম্পদের সমবন্টন হতে পারে।

বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্বল্প সংখ্যক বিরাট ধনীর হাতেই নতুন কিছু করার সুযোগ কেন্দ্রীভূত করেছে। রাজনৈতিক গণতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও একজন পুঁজিপতি ও একজন জীবিকার দুশ্চিন্তায় ব্যস্ত। রাজনৈতিক প্রশ্নের চেয়ে অর্থনৈতিক বিষয় প্রায় সকল সময়েই মানুষের জীবনকে অনেক বেশি গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। ধনীদের জীবনের চালিকা শক্তি হলো অন্য যে কোন লোকের চেয়ে অধিক সম্পত্তি ও ক্ষমতার মালিক হওয়া। এই তাড়না মানুষকে ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে নিজের মনের দ্বার রুদ্ধ করতে বাধ্য করে এবং সামাজিক সমস্যাবলি সম্পর্কে সততার সঙ্গে চিন্তা করা থেকে বিরত রাখে।[১২৮] এ থেকে উত্তরণের উপায় হলো ইসলামী অর্থনীতির কনসেপ্টকে কাজে লাগিয়ে অর্থনীতির সমস্যাবলির সমাধান করা। ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ অর্থনীতির তিনটি বিষয় বা কনসেপ্টকে মূল ভিত্তি বলেছেন। অর্থনীতির মূল ভিত্তিগুলো যথাক্রমে তাওহিদ, খিলাফত ও ইনসাফ । তাওহিদে বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই মু'মিনের সকল চিন্তা ও কাজ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। এ বিশ্বাস তাঁকে সৎকর্মশীল করে তোলে। কারণ, সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে পরকালে আল্লাহর কাছে দুনিয়ার জীবনের ভালো-মন্দ সব কাজের হিসাব দিতে হবে। কোনো বিশ্বাসী নাগরিকই অন্যদের বঞ্চিত রেখে উচ্চ জীবন-মান ভোগ করবে না। ইসলামে দৃষ্টিতে মু'মিনরা একে-অন্যের নিকট একটা ইমারত স্বরুপ, যার প্রত্যেক অংশ অপর অংশগুলোকে দৃঢ় করে। সুতরাং জীবনের সকল ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা হচ্ছে ইসলামের একটি মৌলিক দাবি। খিলাফত হলো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। খিলাফতের তাৎপর্য বিশ্বভ্রাতৃত্ব। সকল মানুষ ভাই বা ভাই-বোন এবং সমতার অধিকারী, সমভাবে তাদের খেয়াল রাখতে হবে। এর আর একটা তাৎপর্য হলো মানুষ মূল মালিক নয়। মূল মালিক আল্লাহ তা'য়ালা এবং সম্পদ একটা আমানত মাত্র। সম্পদকে সেভাবে ব্যবহার করতে হবে যেভাবে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন। তৃতীয় ভিত্তি হলো ইনসাফ বা ন্যায়বিচার। কুরআনে একশ' আয়াতে আদল বা ন্যায়বিচারের কথা বলা হয়েছে। আরো একশ' আয়াতে যুলুমের নিন্দা করা হয়েছে। তার মানে হলো অর্থনীতিতে জুলমের পরিবর্তে ইনসাফ কায়েম করতে হবে। ইনসাফের দাবী হলো সকল মানুষের প্রয়োজন পূরণ ও সম্মানজনক আয়ের ব্যবস্থা করা। যদি কেউ সম্মানজনক আয়ের ব্যবস্থা করতে না পারে কিংবা শারীরিক, মানসিক দূর্বলতার কারণে অর্থনৈতিক বিপর্যস্ত হয়ে পরে তাহলে তাঁর ব্যবস্থা প্রথমে করতে হবে পরিবার বা আত্মীয়স্বজনকে। আর যদি তারা অপারগ হয় তাহলে রাষ্ট্রকে করতে হবে।

ইসলামী জীবনাদর্শের অন্যতম চালিকা শক্তি হলো আমর বিল মারুফ ও নেহি আনেল মুনকার তথা সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির উচ্ছেদ। এই নীতি প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পরিশুদ্ধ করা। তাঁর জীবন ও সমাজকে পবিত্র করা। দুনিয়াতে আল্লাহ মু'মিনদের রাষ্ট্রক্ষমতা দিলে তাঁরা আল্লাহর নির্দেশিত এই অপরিহার্য কাজ দু'টি সবার আগে করবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ '' তারা এমন লোক যাদের আমি যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করি তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। সকল কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে।'' [১২৯] অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় দান করেন, ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় এমন সব কাজের কার্যকরি উদ্যোগ গ্রহণ যা খুলাফায়ে রাশেদীন তাদের শাসনামলে বাস্তবায়ন করেছিলেন। আদর্শ রাষ্ট্রের শাসকের ব্যক্তিগত চরিত্রে নাফরমানি ও অহংকারের পরিবর্তে সালাত কায়েম করা, অর্জিত ধনসম্পদ বিলাসিতা, জাঁকজমক ও নফসের দাসত্বের কাজে ব্যয় হওয়ার পরিবর্তে মানব কল্যাণে ব্যয় করেন। এ রাষ্ট্রের সরকার যাবতীয় ন্যায় কাজ দমন করার পরিবর্তে বিকাশ ও বিস্তারে নিয়োজিত হবে। [১৩০] মা'রুফ বা

সুনীতি, মুনকার বা দুর্নীতি শব্দ দু'টির ব্যাপক নৈতিক, সামাজিক, আন্তর্জাতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমর বিল মারুফের সঠিক তাৎপর্য হলো ইনসাফ ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলা। অর্থনীতিতে এমন সব নীতি, পলিসি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যাতে করে কল্যাণের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়। আর নাহি আনিল মুনকার হলো অর্থনৈতিক অবিচারের সকল পথ বন্ধ করে দেয়া। অর্থনীতি থেকে এমন সব ব্যবস্থা নীতি, পলিসি, প্রতিষ্ঠান, আইন সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা যার ফলে জনগণের কল্যাণ হয়। ইসলাম বহির্ভূত সকল মতাদর্শ ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উপার্জন, ভোগ, বন্টন, উৎপাদন, বিনিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে বৈধতার বিচারে হালাল-হারামের পার্থক্যের কোন মাপকাটি নেই। উপর্যুক্ত ট্যাক্স দিলেই সব ধরনের উপার্জন বৈধ হয়ে যায়। সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত নির্ধারিত কর প্রদান সাপেক্ষে যে কোন উৎস হতে বা যে কোন পরিমাণ অর্থই বৈধ করার সুযোগ আছে। অবৈধ অর্থের প্রভাবে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। কল্যাণ রাষ্ট্রের লক্ষ্যই হলো সামাজিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা। অর্থনৈতিক সকল কর্মকান্ড শরি'য়ার বিধান কার্যকর করা। যা বৈধ ও যে পরিমাণ বৈধ তা সকলের জন্য বৈধ। যা অবৈধ বা হারাম তা সকলের জন্য সমানহারে হারাম।[১৩১] ইনসাফ ভিত্তিক সম্পদ বন্টনের উপর নির্ভর করে দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতি। দেশের নগারিকের কর্মসংস্থান, উৎপাদন বৃদ্ধি, নিয়োগের সুযোগ ও সেই সাথে সম্পদ কারো হাতে যেন পুঞ্জিভূত হতে না পারে তা নির্ভর করে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উপর। ইসলামী অর্থনীতিতে আয় ও ধন বণ্টন কীভাবে হবে তার মূলনীতি উল্লেখ আছে। এখানে স্বেচ্ছাচারিতামূলক আয়ের যেমন সুযোগ তেমনি ইচ্ছামতো ব্যয় ও ভোগের পথও নেই। পবিত্র কুরআনে ব্যবসা ও বাণিজ্য ও বৈধ উপায় ব্যতীত অন্যায়ভাবে কারো গ্রাস করতে নিষেধ করা হয়েছে।[১৩২] সম্পদ যেন কেবল ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয় হয়। সে বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে।[১৩৩] বেহুদা খরচকারীকে কুরআনে শয়তানের ভাই বলে নিন্দা করা হয়েছে। [১৩৪]

উপসংহার

আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্র ও ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য থাকলে উভয় ধারণাই সমাজের কল্যাণ ও নাগরিকের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে যদি তা আদর্শিক মানদন্ডের নিরিখে পরিচালিত হয়। উভয় ধারণাই সমাজে শান্তি, ন্যায়বিচার, নাগরিকের সুরক্ষা, দূর্বল ও অসহায় মানুষদের সাহায্য করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আধুনিক রাষ্ট্রে ভালো-মন্দ,ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য নিরূপণের স্থায়ী কোন আদর্শ বা মাপকাটি না থাকায় যুগে যুগে তা জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে। সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার নির্মূল করার জন্য প্রয়োজন কল্যাণকর কাজের বিস্তার। প্রয়োজন আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা। ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সমতা ভিত্তিক সমাজ ও উন্নত নৈতিক জীবনযাপনের পথ রুদ্ধ করেছে। তাই পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের রূপরেখা থেকে বের হয়ে সত্যিকার একটি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখা কুরআন ও সুন্নাহতে পাওয়া যায়। কুরআন ও সুন্নাহ মানবজীবনের সকল বিষয়ের মৌলিক নীতিমালা বর্ণনা করেছে যা ছাড়া সামগ্রিক রূপরেখা অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে। এ রাষ্ট্রের মূল কাজ হলো সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ। এ রাষ্ট্রব্যবস্থার মানদন্ড হচ্ছে নৈতিক পরিশুদ্ধি, আত্মার উন্নতি ও মর্যাদা বৃদ্ধি। মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথ দেখানো। এ রাষ্ট্রে ন্যায়ের শাসন নিশ্চিত হয়ে সমাজে সকল স্তরে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। বেকারত্ব দূর করে দারিদ্র্যের উৎখাত করা। ইসলামের লক্ষ্যই হলো জনকল্যাণ। শরী'আতের যে দর্শন, অর্থনীতি যে দর্শন তাতেও আছে আদল বা ন্যায়বিচার। আর ন্যায়বিচারের অন্যতম তাৎপর্য হলো প্রয়োজন মেটানো। তার মানে হলো মানুষ তাঁর শরি'আহর সীমার মধ্যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করবে। স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বানিজ্য ও শিল্প গড়ে তুলবে। সম্পদের মালিকানা তাঁরই থাকবে। তাই যে অর্থনীতি মৌলিকভাবে স্বাধীন নয় সেখানে অর্থনৈতিক উদ্যোগ ও প্রবৃদ্ধি বেশি হবে না। যেহেতু ইসলাম ব্যবসা বানিজ্যের ক্ষেত্রে শরি'আহর সীমার মধ্যে মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছে ফলে তা যদি কার্যকর হয় তা হলে এখানে ব্যক্তির বিকাশ হবে। অর্থনীতির বিকাশ হবে। তাই জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান, সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন, অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা, আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অপিরহার্য।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ ড. মো. মাইমুল আহসান খান, *রাষ্ট্রনীতি-রাজনীতি সামজ ও মানবাধিকার* (ঢাকা: সেলফ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১৭

২ *রাষ্ট্রনীতি-রাজনীতি সামজ ও মানবাধিকার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

৩ অ্যারিস্টটল, পলিটিকস্, অনুবাদ: সরদার ফজলুল করিম (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১৬

৪ Max Weber, *Politics as a Vocation* (London: Ruttledge and Kiganpall, 1970), p. 98

৫ Professor J.N Garner, *Political Science and Government* (America: American Book Company, 1928), P. 22

৬ মুহাম্মদ আশরাফ আলী, *ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তা* (ঢাকা: আনন্দ প্রকাশ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ২৮৭

৭ Professor H.J. Laski, *A Grammar of Politics* (London: Routledge Press, 1st ed 2014), P .21

৮ *রাষ্ট্রনীতি-রাজনীতি সামজ ও মানবাধিকার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

৯ David Easton, *A framework for political Analysis* (Engle-wood cliffs, N.G, 1996), p. 92

১০ ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক* (রাজশাহী: রেনেসাঁ পাবলিকেশন্স, মার্চ ২০২১ খ্রি.), পৃ. ৮৩

১১ আব্দুল রশিদ মতিন, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইসলামী প্রেক্ষিত* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট জানুয়ারী ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৯২

১২ *রাষ্ট্রনীতি-রাজনীতি সামজ ও মানবাধিকার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৮

১৩ ড. এমাজ উদ্দীন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা (ঢাকা: বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লি. পুণর্মুদ্রণ জুলাই ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৪১

১৪ জাস্টিস মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী, *ইসলাম ও রাজনীতি* (ঢাকা: ষষ্ঠাদশ মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৪৪

১৫ আর. এম ম্যাকাইভার, *আধুনিক রাষ্ট্র*, অনুবাদ: এমাজ উদ্দীন আহমেদ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ১০

১৬ হারুনুর রশিদ, *রাজনৈতিককোষ* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগষ্ট ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১২৩

১৭ Eric Allardt, Representative Government in a Bureaucratic age, Daedalus, Journals of the American Academy of Arts and Science Vol. 113, No.4, Winter 1984, P. 170

১৮ www.oxfordreference.com was indexed by Google more than 10 years ago

১৯ https://www.investopedia.com/terms/w/welfare-state.

২০ https://en.wikipedia.org/wiki/Welfare, 'Due to the pressure of the workers' movement in the late 19[th] century, Reichskanzler Otto von Bismarck introduced the first rudimentary state scheme.

২১ Jean-Baptiste Say (French: 5 January 1767 – 15 November 1832) was a liberal French economist and businessman who argued in favor of competition, free trade and lifting restraints on business. He is best known for Say's law, `[a]. https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Say

২২ John Maynard Keynes, 1st Baron Keynes,5 June 1883 – 21 April 1946), was an English economist and philosopher whose ideas fundamentally changed the theory and practice of macroeconomics and the economic policies of governments.One of the most influential economists of the 20th century. `[a]. https://en.wikipedia.org/wiki/ John_ Maynard_Keynes

২৩ John Maynard Keynes, *Economic Consequences of the peace* (1920), p. 3, cited by the Mini (1974), p.233

২৪ ড. এম উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৬৪

২৫ *আধুনিক রাষ্ট্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩

২৬ রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কথা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯০

২৭ ইসলামে আন্তজার্তিক সম্পর্ক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১

২৮ রাজনীতি ও ইসলামী রাজনীতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯

২৯ Ahmed Davutoglu, *Alternative Paradigms: The impact of Islamic and Western Welanschamang of Political Theory* (Maryland, University press of America, 1994), p. 190

৩০ রাজনীতি ও ইসলামী রাজনীতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯

৩১ আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ* (বৈরত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৫

৩২ মাওলানা আব্দুর রহীম, *আল কুরআনের রাষ্ট্র ও সরকার* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৫ খ্রি.), পৃ. ১৫০

৩৩ মুহাম্মদ আসাদ, *ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি*, অনুবাদ: শাহেদ আলী (ঢাকা: প্রচ্ছদ প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে ২০১৩), পৃ. ১২

৩৪ ড. এম. রিফাত, *Welfare or Falahi State, Radiance*, ১৬-২২ জুলাই, ২০০৬ সংখ্যা, পৃ. ১২

৩৫ ড. এম. উমর চাপরা, *ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন* (প্রবন্ধ), অর্থনৈতিক গবেষণা সংখ্যা-৯, অক্টোবর ২০০৭, পৃ. ৫

৩৬ অধ্যাপক ড. এম এ হামিদ, *মানব কল্যাণ ও ইসলামী অর্থনীতি*, দৈনিক সংগ্রাম, ২৪ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃ. ৫

৩৭ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামে রাষ্ট্রব্যবস্থা* (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে ২০১৪), পৃ. ১৩৪

৩৮ ড. আহমদ আলী, *সার্বভৌমত্ব : ইসলামী দৃষ্টিকোন* (ঢাকা: গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, মার্চ ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৯

৩৯ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,'' وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا '' তাঁর রাজত্বে কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন,অতপর প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে।' দ্র: আল-কুরআন, সূরাহ্ আল-ফুরকান, ২৫: ২

৪০ ড. আহমদ আলী, *গণতন্ত্র: ইসলামী দৃষ্টিকোণ* (ঢাকা: প্রচ্ছদ প্রকাশনস, ২য় মুদ্রণ, ২০২১ খ্রি.), পৃ. ৩৯

৪১ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, '' يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ الرَّسُوْلِ'' "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল তাদের। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, তবে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছে নিয়ে যাও"। দ্র: কুরআন, সূরাহ্ আন-নিসা, ৪:৫৯

৪২ *রাষ্ট্রনীতি-রাজনীতি সামজ ও মানবাধিকার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

৪৩ আল-কুরআন, সূরাহ্ আল-'আরাফ, ৭: ৫৪

৪৪ আল-কুরআন, সূরাহ্ আশ-শুরা, ৮২: ৩৮

৪৫ *ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

৪৬ শায়েখ আব্দুল হাকিম হক্কানি, *ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা*, *অনুবাদ: আব্দুর রশীদ তারাপাশী* (ঢাকা: উত্তিহাদ পাবলিকেশন, মে ২০২৩), পৃ. ২৫৫

৪৭ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,' فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۪ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ' "কেবল আল্লাহর রহমতের বদৌলতেই আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয়। আর যদি

আপনি রূঢ়, কঠোর-হৃদয় হতেন তবে তারা আপনার নিকট থেকে সরে পড়ত। অতএব আপনি তাদের মার্জনা করুন, তাদরে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং (প্রয়োজনীয়) বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর যখন আপনি (ঐ কাজের) সংকল্প করেন, তখন আল্লাহ্ উপর নির্ভর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর উপর) নির্ভরকারীদের ভালবাসেন।দ্র: আল-কুরআন, সূরাহ্ আলে-ইমরান, ৩: ১৫৯

৪৮ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন 'وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ' ''কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো। অতপর যখন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।'' বি.দ্র.সূরাহ্ আলে-ইমরান, *৩: ১৫৯*

৪৯ *ইসলামী রাষ্ট্রব্যব্যবস্থা*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ২৫৬*

৫০ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,' كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ' "সমস্ত মানুষ একই দীনের অনুসারী ছিল। তারপর আল্লাহ নবীদের প্রেরণ করেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে" দ্র: আল- কুরআন সূরাহ্ আল-বাকরাহ,২: ২১৩

৫১ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদি, *ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান* (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ, আগষ্ট ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৪৬৪

৫২ আল-কুরআন, সূরাহ্ আন-নিসা: ৪: ১

৫৩ আল-কুরআন, সূরাহ্ আল হুজুরাত, ৪৯: ১৩

৫৪ ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, অনুবাদ: মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামী থ্যট, মার্চ ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৪৫

৫৫ ইমাম মুহাম্মদ আবূ যাহরাহ, আল 'আলাকাতুদ দাওলিয়াহ ফীল ইসলাম (কায়রো: দারুল ফিকর আল-'আরাবী, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২২

৫৬ *ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬

৫৭ *ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১

৫৮ *ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭

৫৯ *ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ১১৪

৬০ আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ইল আল বুখারি আল-জুফী র., *সহীহুল-বুখারী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সপ্তম মুদ্রণ,জানুয়ারি ২০১১, কিতাবুল আহকাম হাদীস নম্বর: ৭১৩৮

৬১ যেমন আল্লাহ তা'আল বলেন, '' وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى '' "আর কোন ব্যক্তি অন্যের বোঝা বহন করবে না।" দ্র: আল-কুরআন, সূরাহ্ বনি ইসরাইল, ১৭: ১৫

৬২ *ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা* : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮-২৯

৬৩ *তদেব*, পৃ. ২৫-২৬

৬৪ মজিদ কাদদুরী, *ইসলামের শান্তি ও যুদ্ধ* (ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী পাবলিকেশন, একুশে বইমেলা ২০১০ খ্রি.), পৃ. ২০

৬৫ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,' يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ "হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে (আমার) প্রতিনিধি বানিয়েছি। অতএব তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার করো এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, অন্যথায় তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।" দ্র: আল কুরআন, সূরাহ্ সোয়াদ, ৩৮:২৬

৬৬ 'ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ' "অতঃপর আমি আপনাকে দীনের এক বিশেষ পথের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতএব, আপনি তারই অনুসরণ করুন এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না।" দ্র: আল-কুরআন সূরাহ্ আল-জাসিয়া, ৪৫: ১৮, ' اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَآءَ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ' "তোমরা তারই অনুসরণ কর যা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য বন্ধুদের অনুসরণ করো না। তোমরা খুবই কম চিন্তা করো।" দ্র: আল-কুরআন, সূরাহ্ আল-'আরাফ: ৭: ৩

৬৭ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীর ফী যিলাযিল কুরআন*, ১৭ তম খন্ড (লন্ডন: আল কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স,২০০৩), পৃ. ১৮৩

৬৮ আল-কুরআন, সূরাহ্ আল-নিসা, ৪: ৬০

৬৯ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,' تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ' "এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর যারা আল্লার ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলবে, তিনি তাদের জান্নাতসমূহে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নহর প্রাবহিত, যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে।" দ্র: আল-কুরআন, সূরাহ্ আন-নিসা, ৪:১৩

৭০ আয়াতটি হলো وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ '' আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করো, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। যদি সবর করো, তবে তা সবরকারীদের জন্যে উত্তম।'' দ্র: আল-কুরআন, সূরাহ্ আন নাহল, ১৬:১২৬

৭১ *ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ১৪০*

৭২ *ইসলামী অর্থনীতি দর্শন ও কর্মকৌশল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮

৭৩ *ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০

৭৪ আল-কুরআন, সূরাহ্ আলে-ইমরান, ৩: ১১০

---

[৭৫] যেমন রাসুলুল্লাহ সা. বলেন,‘ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ ’’ “তোমাদের কেউ কোনো অন্যায় দেখলে সে যেন হাত দিয়ে তা প্রতিহিত করে, যদি সে তাতে সক্ষম না হয়, তবে সে যেন মুখে প্রতিহত করে; আর যদি সে তাতেও সক্ষম না হয়, তবে মনে মনে তা পরিবর্তনের পরিকল্পনা করে। এটাই ইমানের দুর্বলতম স্তর।” দ্রঃ সহীহ মুসলিম, হাদিস-৮১, *প্রাগুক্ত*, ১৮৬

[৭৬] আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الْطَّاغُوتَ “আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে।” দ্রঃ আল-কুরআন, সূরাহ্ আন-নাহল, ১৬:৩৬

[৭৭] আল-কুরআন, সূরাহ্ আল-মায়িদাহ, ৫: ২

[৭৮] হাফিজ ‘ইমাদুদ্দীন ‘ইসমাঈল ইবন কাছীর র., *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, ২য় খণ্ড (লন্ডনঃ আল কুরআন একাডেমি পাবলিকেশন্স),পৃ. ৭৮৭

[৭৯] আল কুরআন, সূরাহ্ আল-আ’রাফ ৭: ৫৬

[৮০] যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ “আল্লাহ যেই প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন তাকে হত্যা করো না ” দ্রঃ আল-কুরআন, সূরাহ্ বনি ইসরাঈল, ১৭: ৩৩

[৮১] আল-কুরআন, সূরাহ্ আন-নিসা, ৪: ৯৩

[৮২] আল কুরআন, সূরাহ্ আল-‘আলাক, ৯৬: ১৯

[৮৩] আয়াতটি হলো ‘إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ’’ “নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা করো।” দ্র: আল-কুরআন, সূরাহ্ আল-আন কাবুত, ২৯: ৪৫

[৮৪] আল-কুরআন, সূরাহ্ আল-হজ ২২: ৪১

[৮৫] মুফতি হাসান মাহমুদ, ইসলামী জীবন, দৈনিক কালের কণ্ঠ, শুক্রবার, অনলাইন সংস্করণ, ১ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি.

[৮৬] আয়াতটি হলো,‘ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ’’ “এবং তাদের ধন-সম্পদে অভাবগ্রস্থ ও বঞ্চিতদের হক ছিল।” দ্রঃ আল-কুরআন, সূরাহ্ আয্ যারিয়াত, ৫১:১৯

[৮৭] আল-কুরআন, সূরাহ্ আত-তাওবাহ, ৯: ৬০

[৮৮] আল-কুরআন, সূরাহ্ আল-হজ, ২২:৪১

[৮৯] আল-কুরআন, সূরাহ্ আল-হামীম সেজদাহ, ৪১:৬

[৯০] আল-কুরআন, সূরাহ্ আল-মুযযাম্মিল, ৭৩:২০

[৯১] *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*,পৃ. ১৪

[৯২] আল-কুরআন, সূরাহ্ বাকারা, ২:২৭৫, সূরাহ্ আলে-ইমরান, ৩:১৩০, সূরাহ্ বাকারা, ২: ২৭৮ সূরাহ্ বাকারা, ২:২৭৬

[৯৩] *ইসলামী অর্থনীতি দর্শন ও কর্মকৌশল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

[৯৪] ‘إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ’ “ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করবে।” দ্রঃ আল-কুরআন, সূরাহ্ আন-নিসা, ৪: ৫৮

[৯৫] আল্লাহ বলেন,‘ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ “নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি আশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।” দ্রঃ আল-কুরআন, সূরাহ্ আন-নাহল, ১৬:৯০

[৯৬] ইসলামী অর্থনীতি দর্শন ও কর্মকৌশল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯

[৯৭] *আধুনিক রাষ্ট্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

[৯৮] Concept of welfare State in Islam (Riyasat-e- Madina) in the perspective of Pakistan: An Analysis, Dr. Muhammad Munib Khalid, 55 pages.

[৯৯] *ইসলামী রাজনৈতিক তত্ত্বে রাষ্ট্রধারণা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭২।

[১০০] *ইসলামী রাজনৈতিক তত্ত্বে রাষ্ট্রধরাণা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

[১০১] যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘‘تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ’’ “বরকতময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।” দ্র. আল কুরআন, সূরাহ্ আল-মুলক, ৬৭:০১

[১০২] শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *ইসলাম : রাষ্ট্র ও সমাজ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পুনর্মুদ্রণ জুন, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ.১৯

[১০৩] *ইসলামী রাজনৈতিক তত্ত্বে রাষ্ট্রধরাণা*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ.* ৩৭

[১০৪] *ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা: তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

[১০৫] ইসলামী রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪

[১০৬] *ইসলামী রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১।

[১০৭] আল-কুরআন, সূরাহ্ আল-ইউসুফ, ১২:৪০, সূরাহ্ আল-আন’আমঃ ৫৭, ৬২।

[১০৮] আল কুরআন, সূরাহ্ আশ-শুরা,৪২: ১০।

[১০৯] আয়াতটি হলো,‘ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ‘‘শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক ।’’ দ্র: আল-কুরআন সূরাহ, আল -‘আরাফ, ৭:৫৪

[১১০] ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান আশ’আস আস-সিজিস্তানী র., সুনানু *আবু দাউদ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ১৯৯০ খ্রি),হা নং ৪৭৩১, পৃ. ৪৭৬

[১১১] *গণতন্ত্র : ইসলামী দৃষ্টিকোন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩।

[১১২] ইসলামে আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩ ।

[১১৩] আবুল কাশেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, *ইসলামী আইন ও রাষ্ট্র* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মে ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৬৭

[১১৪] *গণতন্ত্র : ইসলামী দৃষ্টিকোন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

[১১৫] ইসলামী রাজনৈতিক তত্ত্বে রাষ্ট্রধারণা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯

[১১৬] ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলনীতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩

[১১৭] যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ “ আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করে না, তারাই ফাসিক।” দ্র. আল কুরআন, সূরাহ্ আল-মায়িদাহ, ৫: ৪৭

[১১৮] যেমন আল্লাহ তা’আলা বলেন,‘ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ’ দ্র. আল-কুরআন, সূরাহ্ ইউসুফ, ১২:৪০,

[১১৯] যেমন আল্লাহ তা’আলা বলেন,‘ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّه لِلّٰهِ’ দ্র. আল-কুরআন, সূরাহ্ আলে-ইমরান, ৩: ১৫৪

[১২০] *ইসলামে রাষ্ট্র সরকার পরিচালনার মূলনীতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

[১২১] يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ, “হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে। যদিও তা তোমাদের নিজদের কিংবা পিতা-মাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়।” আল-কুরআন, সূরাহ্ আন-নিসা, ৪: ১৩৫

[১২২] যেমন আল্লাহ তা‘আল বলেন,‘‘ يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ’ “হে দাঊদ! নিশ্চয় আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি, অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।” দ্র. আল-কুরআন, সূরাহ সোয়াদ,৩৮: ২৬

[১২৩] ড. আমীর আব্দুল আযীয, *নিযামুল ইসলাম* (কায়রো: দার ইবনুল জাওযী, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১১২

[১২৪] যেমন আল্লাহ তা’আলা বলেন,‘فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا’ “ অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে” দ্র. আল-কুরআন, সূরাহ্ আন-নিসা, ৪: ৬৫

[১২৫] *ইসলামী অর্থনীতি দর্শন ও কর্মকৌশল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

[১২৬] *রাজনৈতিক আদর্শ*, অনুবাদ: আবুল কাশেম ফজলুল হক (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৪০,৪১

[১২৭] *ইসলামী অর্থনীতির দর্শন ও কর্মকৌশল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

[১২৮] *রাজনৈতিক আদর্শ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

[১২৯] আল-কুরআন, সূরাহ্ আল-হজ, ২২: ৪১

[১৩০] *ইসলামী অর্থনীতি দর্শন ও কর্মকৌশল* (ঢাকা: দি আইওনিয়ার, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ১৭৪

[১৩১] শাহ মুহাম্মদ হাবীবুবর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাাচিত প্রবন্ধ* (রাজশাহী: স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১১

[১৩২] যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,‘‘ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ’’ “হে মুমিনগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা।” দ্র. আল-কুরআন, সূরাহ্ আন-নিসা, ৪: ২৯

[১৩৩] যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,‘‘ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ ‘‘শুধু তোমাদের মধ্যকার বিত্তবানদের মাঝেই (ধন-সম্পদ) আবর্তিত না হয়।’’ দ্র. আল-কুরআন, সূরাহ্ আল-হাশর, ৫৯: ৭

[১৩৪] যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ‘‘ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا’’নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।’’ দ্র. আল-কুরআন, সূরাহ্ আল-বনি ইসরাঈল, ১৭:২৭